পঞ্চাশ বৎসর

শ্রীপ্রমথনাথ পাল
সঙ্কলিত

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

২সি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা
হইতে শ্রীঅমূল্যচরণ প্রামাণিক
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য—দুই টাকা আট আনা

আসাম বেঙ্গল প্রেস লিঃ
৬০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

নিবেদন

বিগত বিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাংলার চারিদিকে একটা জিনিষ ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে—তাহা হইতেছে বাঙ্গালীর আধুনিক শিল্প-ব্যবসায়ের চেতনা। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালীর শিল্প-ব্যবসায়ের সাধনা যে স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহা অসম্ভব বিস্ময়কর না হইলেও বা অনেকটা পরিপূর্ণ না হইলেও, নিতান্ত নগণ্যও নহে। সুখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীর এই শিল্প-ব্যবসায়-প্রচেষ্টা পুষ্টির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই পুষ্টির ইতিহাসে কর্ম্মবীর আলামোহনের অবদান এক বিশিষ্ট অধ্যায়।

কর্ম্মবীর আলামোহনের নাম আজ বাংলার ছোট-বড় প্রায় সকলেরই নিকট বিশেষভাবে পরিচিত; শুধু তাহাই নয়, বাংলার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও তাঁহার নাম অজানা নাই। কর্ম্মবীর যে কয়টি বিরাট যৌথব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান (লিমিটেড্ কোম্পানী) স্থাপন করিয়াছেন, তাহাদের সমাবেশে হাওড়া সহরের বহিঃপ্রান্তে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লাইনের দুই পার্শ্বে 'দাশনগর' গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দাশনগর-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন শাখা ভারতের নানাস্থানে স্থাপিত হইয়া কর্ম্মবীর তথা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অর্থনৈতিক বিজয়াভিযান ঘোষণা করিতেছে। আর সেই সঙ্গে এই সত্যও প্রকাশ করিতেছে যে, নিঃসম্বল আলামোহনের অবিচল মনোবলই এই সকল বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠান রচনার সুদৃঢ় ভিত্তি। আমরা কথায় কথায় মারোয়াড়ীদের লোটা-কম্বল-সম্বলের উদাহরণ দিয়া নিঃসহায় দৈন্যের আত্মপ্রসাদ লাভ করি। আর সেই

সঙ্গে তাহাদের ব্যবসায়-গত প্রাণ, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সহানুভূতিময় সামাজিক জীবনের কথা ভুলিয়া যাই। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোক বাংলাদেশে আসিয়া অন্ন লুটিয়া লইতেছে। আর বাঙ্গালী তাহাদের নিজেদেরই সহমর্ম্মিতার অভাবে খাদ্য পাইতেছে না। বাংলার ভাবপ্রবণ আব্‌হাওয়ায় জন্মগ্রহণ ও পুষ্টি লাভ করিয়া কর্ম্মবীর আলামোহন প্রমাণ করিলেন, যথার্থ একনিষ্ঠতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা থাকিলে অরণ্যে-প্রান্তরে সুশোভন নগর নির্ম্মাণ করা যায় এবং এই ভাববিলাসী বাঙ্গালী জাতিও শুধু ভাবময় চারুশিল্প ও সুকুমার সাহিত্যে নয়, কঠোর নির্ম্মম বস্তুপ্রধান ব্যাপারেও এই দুনিয়ায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারে। আর তিনি ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাই শিক্ষার চরম কথা নয়। ব্যক্তিগত জীবনের ভূয়োদর্শনই চরম সত্য। কর্ম্মবীর দাশ বাংলার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান বিষয়ে যে পারংগত আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান বাংলার অনুকরণীয় হওয়া একান্ত আবশ্যক। আলামোহন-বাবু বয়সে এমন কিছু প্রবীণ নন্, তবে কর্ম্মে। তাঁহার কর্ম্মপ্রেরণায় অচঞ্চল অকুণ্ঠ সহযোগিতা করিবার বাসনা প্রকাশের দ্বারা তাঁহার জীবনপ্রবাহকে উদ্দীপ্ত রাখিবার জন্য আর তাঁহার কর্ম্মধারা ও সেবার স্পর্শে সঞ্জীবিত সমগ্র বাঙ্গালী জাতির আনন্দোদ্বেল হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য গত ১৬ই বৈশাখ তাঁহার পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উৎসবে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। সেই সার্থক অভিনন্দনকে স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের সঙ্কলন ও প্রকাশ।

যাঁহাদের রচনা-সম্পদে এই গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট হইল এবং এই গ্রন্থসঙ্কলনে যাঁহাদের নিকট হইতে কিছুমাত্র সাহায্য লাভ করিয়াছি তাঁহারা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

যে সকল লেখককে তাঁহাদের রচনার প্রুফ দেখাইয়া সংশোধনের কথা ছিল তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও সময়াভাবে প্রুফ দেখাইয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই; সে-কারণে ও মুদ্রাকরের অমনোযোগিতা হেতু পুস্তকের স্থানে স্থানে ভুলত্রুটি দৃষ্ট হইতে পারে। সেজন্য সহৃদয় সুধী লেখক ও পাঠকগণ যেন ক্ষমা করেন।

আশ্বিন, ১৩৫১
কলিকাতা

শ্রীপ্রমথনাথ পাল

সূচী

পঞ্চাশ বৎসর—

কর্মবীর শ্রীআলামোহন দাশ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অভিমত—

[illegible]

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়

I have visited all the works in company of the Manager & Engineer of the Bengal Chemical

14/7/38

P. C. Ray

পঞ্চাশ বৎসর

—:*:—

কর্ম্মবীরের জাত্ বাঙালী *

বিনয় সরকার

কর্ম্মবীর কাকে বলে ?

লেখক—শুন্‌লাম দাশনগরে আলামোহনের পঞ্চাশদ্ বর্ষ-সম্বর্দ্ধনা-সভায় (১৯ এপ্রিল, ১৯৪৪) আপনি ব'লেছেন যে, বাঙালীরা কর্ম্মবীরের জাত্। দুনিয়ার অন্য কোনো জাতের তুলনায় বাঙালী জাত্ কর্ম্মবীরের হিসাবে খাটো নয়। এ কথার মানে কী ?

সরকার—কর্ম্মবীরের গুণ্‌তিতে হয়তো বাঙালী জাত্ খাটো। বাঙালীরা বিদেশীদের কর্ম্মদক্ষতার মাপেও হয়ত খাটো। কিন্তু কর্ম্মবীরের চরিত্র হিসাবে আমরা খাটো নই। কর্ম্মবীরের আসল লক্ষণ হচ্ছে, দুরবস্থার সঙ্গে লড়াই করা, বাধাবিঘ্নকে জুতিয়ে দুরস্ত করা, প্রতিকূল শক্তিসমূহকে হারিয়ে সংসারে দাঁড়িয়ে থাকা। দুনিয়ায় ঘাড় খাড়া রাখ্‌তে পারা হচ্ছে বীরত্ব। এই হলো আমার পারিভাষিক কর্ম্মবীর-লক্ষণম্।

লেখক—অন্যান্য জাতের পাশে আপনি এই হিসাবে বাঙালীকে বসাতে পারেন ?

---

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের সঙ্গে সংবাদপত্রসেবী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার, এম্. এর. মোলাকাৎ।

সরকার—হাঁ। ইংরেজ বাচ্চা, জার্ম্মান বাচ্চা, মার্কিন বাচ্চা, জাপানী বাচ্চা, রুশ বাচ্চা ইত্যাদি নামজাদা জাতের ছোকরা-জোআন-প্রবীণেরা বাধাবিঘ্নকে জুতোতে জানে বটে। আমরা বাঙালীর বাচ্চারাও দেশের, সংসারের ও সমাজের প্রতিকূল শক্তিগুলাকে ঠিক্ করতে কম ওস্তাদ নই। ওরা যদি কর্ম্মবীর হয়, আমরাও তাহ'লে কর্ম্মবীর। ওসব দেশ যদি কর্ম্মবীরের দেশ হয়, আমাদের বাঙলা দেশও কর্ম্মবীরের দেশ। হাজার বার হাজার জায়গায় ব'লেছি, বাঙালী জাত্ বড় জাত্। তার মানে বাঙালীরা কর্ম্মবীরের জাত্। বরং ও-সব দেশের তুলনায় বাঙ্লাদেশের একটা জবরদস্ত বিশেষত্ব আছে। বীর তো বীর বাঙালী বীর।

লেখক—কী সেই বিশেষত্ব? বাঙালী বীরের এত তারিফ কেন?

সরকার—বিলাত, জার্ম্মানি, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে গবর্মেণ্টের সাহায্য কোনো-না-কোনো উপায়ে কর্ম্মীদের জীবনে পৌঁছে থাকে। ও-সব দেশের লোকেরা নানা রকমের সরকারী সাহায্য ভোগ করে। ভারতে আমাদের কর্ম্মীরা প্রায় সকলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ কব্জার জোরে কাজকর্ম্ম চালাতে বাধ্য। একমাত্র নিজ ক্ষমতায়, বিনা সরকারী সাহায্যে বাঙালীর বাচ্চাকে গবেষণা চালাতে হয়, আবিষ্কারে লেগে থাকতে হয়, কারবার ফাঁদতে হয়, দুঃসাহসের অভিযানে আগুয়ান হ'তে হয়। বাহাদুরি বেশী কার? তাদের, না, আমাদের? আমার জবাব,—বাঙালীর বাচ্চার, ভারতসন্তানের কৃতিত্ব বেশী। কর্ম্মবীর হিসাবে বাঙালীর বাচ্চাই দুনিয়ায় সম্বর্দ্ধনা-যোগ্য। জগতের সেরা বীর বাঙালী।

লেখক—আলামোহনের মতন কর্ম্মবীর বাঙ্‌লাদেশে অনেক দেখ্‌তে পান কি?

সরকার—আমার চোখে প্রায় যে-কোনো বাঙালীর বাচ্চাই কর্ম্মবীর। কেউ ছোট, কেউ বড়, আর কেউ মাঝারি কর্ম্মবীর। বাঙালী আমরা প্রায় সকলেই প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে লড়াই চালাতে-চালাতে এগিয়ে যাচ্ছি। দুনিয়া বাধা দিচ্ছে আমাদের অসংখ্য দিক্ থেকে। সেই সব জুতিয়ে দুরস্ত করা প্রায় প্রত্যেক বাঙালীরই জীবন-কথার অন্তর্গত।

লেখক—দু-একটা বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় চাই।

সরকার—গরীব অবস্থা থেকে টাকাকড়ি রোজগারে বড়লোক হওয়ার দৃষ্টান্ত চাও? বাঙ্‌লাদেশে পাবে হাজার-হাজার। লেখাপড়ায় যারা খাটো তারাও কি গরীব থেকে যায়? না, তাদের অনেকে বাঙ্‌লাদেশে পয়সা রোজগারের কর্ম্মক্ষেত্রে চরম উন্নতি দেখিয়েছে। কি নির্ধন, কি নিরক্ষর বা অর্দ্ধশিক্ষিত দুই শ্রেণীর লোকই বাঙালী সমাজে দুনিয়াকে জুতিয়ে বড়লোক হয়েছে। তারা সকলেই জবরদস্ত কর্ম্মবীর। বাঙ্‌লায় কর্ম্মবীরের পায়দা হয়েছে ঝুড়ি-ঝুড়ি। এই হিসাবেও বঙ্গজননী বীর-প্রসবিনী।

লেখক—সাধারণতঃ এই কথাটা আমাদের মনে আসে না কেন? আমরা দু' একজন কর্ম্মবীর দেখ্‌লে তাদেরকে একমাত্র বা "সবেধন নীলমণি" বিবেচনা করি কেন?

সরকার—সাধারণতঃ লোকেরা বীরত্ব মাপে সাংসারিক সফলতা দেখে। কোনো লোক যদি বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন চালাতে পারে তবে তাকে কর্ম্মবীর বলা দস্তুর। লোকে চায় কৃতকার্য্যতা, সার্থকতা, বিজয়লাভ।

কর্ম্মবীর আবিষ্কারের পেশা

লেখক—আপনি কর্ম্মবীর মাপেন কী দেখে?

সরকার—আমি জয়-পরাজয় দেখি না। আমি দেখি শুধু সংগ্রাম। লোকটা বাধাবিঘ্নকে জ্বতোচ্ছে কি না? লোকটা প্রতিকূল দুনিয়ার ঘাড় মট্‌কাতে চেষ্টা করছে কি না? যে-লোকটা লড়াই করছে সেই লোকটা বীর। যদি লড়াইয়ে হেরেও যায়, তবুও সে বাপ্‌কা বেটা। এই আমার বিচার। যে লড়াই করে না সে নরাধম। বীরত্ব—লড়াইশীলতা, সংগ্রামনিষ্ঠা। কর্ম্মবীর-আবিষ্কারের পেশায় আমি আর কিছু দেখি না।

লেখক—সাধারণতঃ লোকেরা কর্ম্মবীরদের সফলতা বা কৃতকার্য্যতা মাপে কী দেখে?

সরকার—প্রথমতঃ দেখে টাকাকড়ির বহর। দ্বিতীয়তঃ দেখে সরকারী পদবী, খেতাব ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ দেখে দেশবিদেশে নাম-ডাক। এই হচ্ছে কর্ম্মবীর জরীপ করবার তিন অতি-সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী।

লেখক—এই তিন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জরীপ স্থরু করলে বহুসংখ্যক কর্ম্মবীর দেখা যায় না কি?

সরকার—না। গোলযোগ আছে। ভুলচুকের সম্ভাবনা আছে। এতে দেমাকী মেজাজের খেলা দেখ্‌তে পাই। অহঙ্কারের প্রভাব আছে। টাকাওয়ালারা বেশ দেমাকী। তারা যখন-তখন যে-সে লোককে টাকাওয়ালা হিসাবে বড় বল্‌তে নারাজ। তারা মনে করে যে,একমাত্র তারাই টাকাওয়ালা। তাদের মেজাজে তারাই দেশের পাঁড়, তাদের সমান ধনী

আর কেউ নাই। অতএব দেশে কর্ম্মবীরের সংখ্যা খুব কম। পদবীওয়ালাদের অহঙ্কার খুব বেশী। তারা ভাবে যে, তাদের সমান ইজ্জদ বেশী বাঙালী পায় নি। অতএব এই হিসাবেও বাঙালী কর্ম্মবীর গুন্‌তিতে নগণ্য। আর দেশবিদেশে নামওয়ালা বাঙালীরা সবাই "আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ" বিশেষ। তারা মনে করে যে, তাদের সমান নামওয়ালা লোক বাঙলা দেশে খুবই কম, ঠিক যেন নাই বল্‌লেই চলে। যাকে-তাকে এই শ্রেণীর দেমাকীরা নামদার লোক সম্‌ঝিতে নারাজ। সুতরাং এই মেজাজেও কর্ম্মবীর বাঙালী বেশী নাই। মেজাজের এই সকল দুর্ব্বলতা ধনী পদবীশীল নামদার নরনারীর পক্ষে স্বাভাবিক। এই তিন শ্রেণীর লোকের মগজে নতুন নতুন কর্ম্মবীর স্বীকার করা একপ্রকার অসাধ্য। এই সব দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে মাত্রাবিশেষে অহঙ্কারের খেলা। দেমাকীদের দৃষ্টিভঙ্গী মামুলি দৃষ্টিভঙ্গী হ'তে আলাদা চিজ।

লেখক—এই তিন দৃষ্টিভঙ্গীর গলদ কোথায়?

সরকার—আমি গরীব মানুষ। পয়সাওয়ালা, পদবীওয়ালা, নামওয়ালা লোকজনের মেজাজে ঢুকবো কী ক'রে? গরীবের চোখে অল্প আয়ের লোকও ধনী, আবার গরীবরাও কর্ম্মবীর। সরকারী পদবী কেমন ক'রে জুটে, তা আমার পক্ষে বুঝা অসম্ভব, তা'ছাড়া পদবীহীন লোকও কর্ম্মবীর হ'তে পারে। অধিকন্তু নাম-ডাকের মাত্রায় কম-বেশী থাকা স্বাভাবিক। নামটা ঘটনাচক্রে হয়ত বাড়ে কমে। কে জানে? এই সবের ভেতর বোধ হয় রহস্য আছে।

লেখক—কর্ম্মবীর আবিষ্কারের জন্য আপনি কী কর্‌তে চান?

সরকার—টাকার গরম, পদবীর গরম, নাম-ডাকের গরম বাদ দিয়ে কর্ম্মবীর আবিষ্কার করার দিকে আমার মতি-গতি। সত্যি কথা, দেশবিদেশের কর্ম্মবীর আবিষ্কার করা আমার অন্যতম পেশা। এই পেশায় পয়সা ইত্যাদি চিজের বালাই আমার নাই। সর্ব্বদাই ঢুঁড়্‌ছি লোকজনের লড়াইশীলতা, সংগ্রাম-নিষ্ঠা, দুনিয়াকে জুতোবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা। এই লড়াইয়ে যে পাশ সে-ই আমার কর্ম্মবীর।

রোজগার-মাফিক কর্ম্মবীর-জরীপ

লেখক—আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছি,—টাকাওয়ালারা কি টাকা রোজগারের পরিমাণ না দেখে কাউকে কর্ম্মবীর ঠাওরাতে পারে না?

সরকার—অবস্থা ঠিক তাই। শুধু টাকাওয়ালারা কেন, জন-সাধারণ ও দেশের অধিকাংশ লোকই রোজগারের মাপে কর্ম্মবীর জরীপ কর্‌তে অভ্যস্ত। সংসারের লোকজনের মতিগতি নিম্নরূপ। লাখ পাঁচেক যার রোজগার, সে দেড়-লাখীর চেয়ে বড় কর্ম্মবীর। লাখপতির চেয়ে ছোট কর্ম্ম-বীর হচ্ছে পঞ্চাশহাজারপতি ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত শ' খানেক বা গোটা পঞ্চাশেক যার রোজগার, সে বেচারা কর্ম্মবীর একদম নয়। এই হচ্ছে দুনিয়ায় কর্ম্মবীরের জরীপ-প্রথা। রোজগার-মাফিক কর্ম্মবীর জরীপ করার রীতি অতি সনাতন ও সার্ব্বজনিক।

লেখক—এই জরীপ-প্রথার দোষ কোথায়?

সরকার—সহজে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মনে করো দুনিয়ার কোনো দেশে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার লড়াই চল্‌ছে পঞ্চাশ-পঁচাত্তর-শ' বছর ধ'রে। শেষ পর্য্যন্ত দেশটা স্বাধীন হ'য়ে গেল শ' বছরের শেষ দিন। সেইদিনকার স্বদেশ-সেবকদের ছাড়া আর কাউকে বাপ্‌কা বেটা কর্ম্মবীর বলা সাধারণতঃ দস্তুর নয়। কিন্তু এই বিচার যুক্তিসঙ্গত কি?

লেখক—আপনার বিচার কিরূপ?

সরকার—আমার বিচারে সেই দেশের স্বদেশ-সেবক রাষ্ট্রনিষ্ঠ কর্ম্মবীর হাজার-হাজার। তারা কারা? তারা শ' বছর ধরে জেল খেটেছে, না খেয়ে মরেছে, দেশ-বিদেশে স্বদেশের স্বাধীনতার ঝাণ্ডা খাড়া ক'রেছে, আর তার জন্য নানা নির্য্যাতন সয়েছে, এখানে-ওখানে-সেখানে প্রাণ দিয়েছে। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার বেলায় চরম অবস্থার শেষ স্বদেশ-সেবকরাই একমাত্র বীর নয়। সফলতাপ্রাপ্ত শেষ কর্ম্ম-বীরদের চেয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বদেশ-সেবকদের অনেকেই চরিত্র-বত্তায় আর স্বার্থত্যাগে হয়ত বেশ-কিছু মহত্তর। ঠিক তেমনি প্রত্যেক দেশেই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে র'য়েছে হাজার-হাজার কর্ম্মবীর। তার ভেতর দু'-চার-দশজন হয়ত টাকার মুখ দেখ্‌তে পায়, বাড়ী-গাড়ীর বিলাস ভোগ করে। কিন্তু তারাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য কর্ম্মবীর নয়। অন্যান্যেরাও কর্ম্মবীর। হয়ত খুব উঁচু দরেরই কর্ম্মবীর।

শ'-পাঁচেক আলামোহন (১৯৪৪)

লেখক—বাঙ্‌লা দেশের কর্ম্মবীর সম্বন্ধে কিছু বলুন না?

সরকার—বাঙালী কেরাণী ইস্কুল-মাষ্টার শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই বীর। আট-দশটা ছেলে-মেয়ের পরিবার নিয়ে গেরস্থালী চালানো বীরত্ব। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বড়-বড় সংসার চালানো মামুলি কাজ নয়। জীবন-সংগ্রামে ঘাড় খাড়া রাখা খুবই বাহাদুরির কাজ।

লেখক—বাঙালী গেরস্থদেরকে বীর বলছেন কেন?

সরকার—বড়-বড় পরিবারের ছেলে-মেয়েদেরকে মানুষ ক'রে তুল্‌ছে তারা। তারা দেশকে বাড়িয়ে দিয়েছে অসংখ্য উপায়ে। স্বার্থত্যাগ, স্বদেশ-সেবা, সাহিত্য-সৃষ্টি, শিল্প-সৃষ্টি, বিজ্ঞান-গবেষণা, কারখানা-স্থাপন, বৃহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাজের জন্য লোক এসেছে কোন্‌ শ্রেণীর পরিবার হ'তে? প্রধানতঃ পঁয়ত্রিশ-পঞ্চাশ-পঁচাত্তর টাকার রোজগারওয়ালা পরিবার হ'তে এসেছে এই ধরণের জগদ্‌বরেণ্য বাঙালীর বাচ্চা। বাঙালীর কেরাণী কর্ম্মবীর। বাঙ্গালীর ইস্কুল-মাষ্টার কর্ম্মবীর। পয়সাওয়ালা লোকের ছেলেরা এই সকল স্বদেশ-সেবার কাজে যত নেমেছে তার চেয়ে বেশী নেমেছে গরীব লোকের ছেলেরা। বাঙালীর গরীবেরা কর্ম্মবীর। কেরাণীর কুটিরে জন্মেছে দেশপ্রাণ কর্ম্মবীর। ইস্কুল-মাষ্টারের ঘরে দেখা দিয়েছে স্বদেশযোগী কর্ম্মবীর।

লেখক—এই ধরণের দৃষ্টান্ত কি অনেক আছে?

সরকার—উনবিংশ শতাব্দীর আগাগোড়া দেখ্‌তে পাই এই দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি। গরীবের বাচ্চারাই অনেকাংশে বর্ত্তমান ভারতের আসল কর্ণধার বা ধুরন্ধর। দু'-চার-দশজন পয়সাওয়ালা লোকের কৃতিত্ব অস্বীকার করার দরকার

নাই। কিন্তু বেশীর ভাগই দেখা যায় যে, অজ্ঞাত-কুলশীল বাপ্‌মার ছেলেরা নিজ হাত-পার জোরে আর মাথার জোরে বাঙ্‌লা দেশে গণ্য-মান্য হয়েছে। বাঙালী জাত্‌কে বাড়্‌তির পথে ঠেলে দিয়েছে গরীবের বাচ্চারা।

লেখক—বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সম্বন্ধেও কি সে কথা বলা চলে?

সরকার—আলবৎ চলে, খুব বেশী-বেশী চলে। ১৯০৫ সনের গৌরবময় বঙ্গবিপ্লব কায়েম ক'রেছিল কারা? সেদিন হ'তে আজ পর্য্যন্ত কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কাজে, স্বরাজ-স্বাধীনতার কাজে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাজে, সুকুমার শিল্প-সাহিত্যের কাজে কোন্ কোন্ শ্রেণীর বাঙালীর দান আকার-প্রকারে বেশী? প্রধানতঃ গরীব পরিবারের ছেলেরাই স্বদেশী-স্বরাজ-স্বাধীনতা-জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে অগ্রণী হয়েছে। ১৯৪৪ সনে ব্যাঙ্কিং, বীমা, যন্ত্রপাতির কারখানা, বিজলীর ফ্যাক্টরী, ওষুধের কারখানা, বহির্ব্বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজে অনেক বাঙালী টাকার মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছে। এদের অনেকে বাঙালী কারবারের প্রবর্ত্তক বা মালিক। কেহ কেহ হয়ত অ-বাঙালী ভারতীয় বীমা-ফ্যাক্টরী ইত্যাদি শিল্প-বাণিজ্যের কর্ম্মকর্ত্তা। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই এক একজন আলামোহন। পঁচিশ বছর আগে এদের অধিকাংশই ছিল গরীব। তাদের বাপ-দাদারা ছিল আরও গরীব।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান যে, স্বদেশী যুগের পরবর্ত্তী আজ পর্য্যন্ত যত বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যে আর নতুন-নতুন কৃষি-শিল্পে লেগে রয়েছে তারা সকলেই আলামোহন দাশের মতন কর্ম্মবীর?

সরকার—অবিকল তাই বল্‌ছি বারে বারে। কোনো আলামোহন হয়ত গণ্ডাকয়েক টাকা বেশী রোজগার কর্‌ছে, আর কোনো আলামোহন হয়ত কারবারটা খাড়া কর্‌তে গিয়ে হায়রাণ-পরেষান হ'য়ে প'ড়েছে। কোনো আলামোহন নিজ কারবারের মালিক, কোনো আলামোহন হয়ত পরকীয় কারবারের কর্ম্মকর্ত্তা। সব রকমই আছে, লাখপতি-দশলাখপতি দু'-চার জন যে নাই তা নয়। আবার হাজারি, চার-হাজারিও বেশ-কিছু দেখা যায়। তা'ছাড়া "অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ"-মেজাজী শিল্পী-বেপারীর সংখ্যা অগণিত।

লেখক—একালের বাঙ্‌লায় কতজন আলামোহন দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—মাটী কাম্‌ড়ে প'ড়ে রয়েছে শ'য়ে-শ'য়ে হাজারে-হাজারে বাঙালীর বাচ্চা। কোনো মিঞা রয়েছে ব্যাঙ্ক নিয়ে, কোনো মিঞা রয়েছে ফ্যাক্‌টারি নিয়ে। কারু হাতে চল্‌ছে বীমার হাল, কারু তদ্‌বিরে চল্‌ছে বহির্ব্বাণিজ্য। এরা সকলেই কর্ম্মবীর। এমন কি, মারোয়াড়ি-শাসিত বড়বাজারেও বাঙালী বেপারির টিকি দেখা যাচ্ছে মন্দ নয়। ষ্টক একৃস্‌চেঞ্জে বাঙালীর ছায়া পড়েছে। বাঙালী জাতের ট্যাঁকে আজকে আলামোহনের সংখ্যা কম-সে-কম শ'-পাঁচেক। ১৯২৫ সনে হয়ত ছিল শ'-দুয়েক। ১৯০৫-এ বোধ হয় একশ'র বেশী ছিল না। ১৯৬৫-৭০ সনে দেখা যাবে হয়ত হাজার দেড়েক। বাড়তির পথে বাঙালী সম্বন্ধে এই আরেক জরীপ-প্রণালী। তুলনায় বুঝ্‌বার জন্য জেনে রাখা ভাল যে, জার্ম্মান-সমাজে বা বিলাতে র'য়েছে বোধ হয় লাখ পাঁচেক আলামোহন।

যাদবপুর কলেজের শিল্পী-বণিক

লেখক—আপনাদের যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাশ-করা ছেলেদের কাজকর্ম্ম কিরূপ?

সরকার—বাঙালী কর্ম্মবীরদের ফিরিস্তি দেবার সময় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রবর্ত্তিত এই কলেজের ছোকরাদের কাজ সর্ব্বদাই মনে রেখে চলা উচিত। শুধু কল্‌কাতা নয়, তামাম ভারতের কারখানাসমূহে যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নাম-ডাক আছে।

লেখক—এর মানে কী?

সরকার—ভারতের সর্ব্বত্রই যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক কারবারে যাদবপুরের এঞ্জিনিয়ারেরা বাহাল আছে। বাঙালীর বাচ্চা এই কলেজের দৌলতে নানা ভারতীয় কর্ম্মকেন্দ্রের বেপারিমহলে এঞ্জিনিয়াররূপে পরিচিত। পার্শী, ভাটিয়া, গুজরাতী, মারোয়াড়ি সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের তারিফ করে। বাঙালী এঞ্জিনিয়ার জোগানোই যাদবপুরের একমাত্র কীর্ত্তি নয়। অন্যান্য কৃতিত্বও আছে।

লেখক—যাদবপুর কলেজের অন্যান্য কীর্ত্তি কী?

সরকার—নয়া বাঙলার শিল্প-বাণিজ্য বেশ-কিছু গ'ড়ে উঠেছে যাদব-পুরের ছোকরাদের কর্ম্মবীরত্বে। এই কলেজের পাশ-করা বা ফেল-করা ছাত্রদের ভেতর বহুসংখ্যক আলামোহন ঢুঁড়ে পাওয়া যায়। যাদবপুরী এঞ্জিনিয়াররা বঙ্গীয় স্বদেশী আন্দোলনের তাজা-তাজা খুঁটা।

লেখক—যাদবপুরী আলামোহনেরা কিরূপ শিল্প-বাণিজ্যে মোতায়েন আছে?

সরকার—কোন্ শিল্পেরই বা নাম করবো আর কোন্টারই বা করবো না? হরেক প্রকার কারবার চালাচ্ছে যাদবপুরের যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ারেরা। বাঙ্লা দেশের অনেকগুলা কারখানা চল্ছে এদের তদ্বিরে। কলেজের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা ও অধ্যাপক ত্রিগুণা সেনের সঙ্গে মোলাকাৎ চালাতে পারো, অনেক খবর পাবে। ত্রিগুণা যাদবপুরী এঞ্জিনিয়ার আর জার্ম্মানির (মিউনিখের) যন্ত্র-ডক্টর।

লেখক—যাদবপুরের এঞ্জিনিয়ারদের গ'ড়ে-তোলা কয়েকটা কারবারের নাম করুন না?

সরকার—নারায়ণগঞ্জে (ঢাকা) যন্ত্রপাতি, বিজলি ও লোহার কার-খানার কর্ম্মকর্ত্তা প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় নয়া বাঙলার জবরদস্ত প্রতিমূর্ত্তি। শিলিগুড়ি, কালিম্পঙ, পাবনা ইত্যাদি অঞ্চলেও এঁর বিজলির কারবার চলে। প্রফুল্ল বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার। কল্কাতায় নামজাদা হয়েছে নাস্কো কোম্পানী। "অজন্তা সাবান" তৈরী হচ্ছে। কর্ম্মকর্ত্তা রতন দত্ত যাদবপুরের রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার। জার্ম্মানীর অভিজ্ঞতাও রতনের আছে।

লেখক—এঁদেরকে কর্ম্মবীরের ফিরিস্তিতে ঠাঁই দেবেন?

সরকার—আলবৎ। এই ধরণের আট-দশ ডজন কর্ম্মবীরের হদিশ দিতে পারে যাদবপুর। শচীন সাহা "ভারত ব্যাটারীর" প্রতিষ্ঠাতা। ঘর-বাড়ী তৈয়ারীর কাজে আজকাল নামজাদা সুধীর দত্ত। বৃটিশ ইণ্ডিয়া কনষ্ট্রাকসন্ কোম্পানী চল্ছে এই হাতে। সুধীর বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার।

লেখক—বিলাতী ও মার্কিন অভিজ্ঞতাওয়ালা যাদবপুরের এঞ্জিনিয়ার আছে কি?

সরকার—কেন থাকবে না ? বেল্টিং ও বৈদ্যুতিক কারবারের অন্যতম আলামোহন হচ্ছে সুরেন রায়। এঁর ভাই কিরণ ওরিয়েণ্টাল মার্কেণ্টাইল কোম্পানীর ধুরন্ধর। দু'জনেরই মারফৎ মার্কিন অভিজ্ঞতা আমদানী হয়েছে। কিরণ আজ-কাল যাদবপুর কলেজের সেক্রেটারী। ত্রিগুণার মতন এঁর কাছেও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ছোকরাদের বর্ত্তমান হালচাল জানতে পারা যাবে। প্রভাতী টেক্সটাইল মিলের ক্ষিতীশ বিশ্বাসও মার্কিন অভিজ্ঞতাওয়ালা যাদবপুরী এঞ্জিনিয়ার।

লেখক—বিলাতী অভিজ্ঞতাওয়ালা কোনো যাদবপুরী এঞ্জিনিয়ার আছে কি ?

সরকার—"প্লাইক্রীট কোম্পানি" খাড়া হয়েছে। এটা লড়াইয়ের মরশুমে নাম করেছে বেশ। ইস্পাত-লোহার পরিবর্ত্তে চটের ব্যবহার এই ব্যবসার অন্যতম লক্ষণ। কারবারটা হচ্ছে চটের উপর কংক্রীট লাগানো। বলা বাহুল্য, অনেক টাকা বেঁচে যায় কারবারীদের। সুরেন দত্ত প্লাইক্রীট কোম্পানীর প্রবর্ত্তক। যাদবপুরের পর গ্লাসগো ঢুঁ মেরে আসা লোক। এ কালের অন্যতম আলামোহন।

যাদবপুরী মেজাজ ও যাদবপুরী ধারা

লেখক—আপনার বিবেচনায় যাদবপুর কলেজের দান বাঙালী সমাজে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কি ?

সরকার—নিশ্চয়। যাদবপুর কলেজের প্রথম দান যাদবপুরী মেজাজ, খেয়াল বা মর্জ্জি।

লেখক—যাদবপুরী মেজাজ আবার কী ?

সরকার—১৯০৫ সনের গৌরবময় বঙ্গবিপ্লব বাঙালীর বাচ্চাকে একটা নয়া দৃষ্টিভঙ্গী আর নয়া দর্শন দিয়েছিল। সেই দৃষ্টিভঙ্গী আর দর্শনের অন্যতম বর্ত্তমান প্রতিমূর্ত্তি হচ্ছে যাদবপুরী মেজাজ।

লেখক—বঙ্গবিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গী আর দর্শন বল্‌লে কী বুঝা যাবে?

সরকার—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বুঝ্‌তে হবে প্রাকৃতিক শক্তিগুলাকে মানুষের কাজে লাগানো। কর্ম্মমূলক বিজ্ঞান আর এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার দর্শন হচ্ছে তাই। যাদবপুরী মেজাজে সেই দর্শনকে জ্যান্ত আকারে পাক্‌ড়াও করা সম্ভব।

লেখক—যাদবপুরের আর কোনো দান আছে?

সরকার—দ্বিতীয় দান হচ্ছে যাদবপুরী ধারা। বছর বিশেকের ভেতর যাদবপুরের এঞ্জিনিয়াররা বাঙ্‌লার ও ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে কতকগুলা ঠিকানা কায়েম করতে পেরেছে। ঠিকানাগুলা নিরেট আর মজবুদও বটে। এই সকল ঠিকানার সাহায্যে বাঙালী এঞ্জিনিয়াররা ধাপে-ধাপে নয়া বাঙলার ইতিহাস গ'ড়ে তুল্‌ছে। এই হচ্ছে একটা নয়া ঐতিহ্য, নয়া ধারা, নয়া রীতি। যাদবপুরী মেজাজ আর যাদবপুরী ধারা বিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনকে নয়া-নয়া আচার আর নয়া-নয়া সংস্কারে বাড়্‌তির পথে ঠেলে তুল্‌ছে। বঙ্গ-সংস্কৃতিতে যাদবপুরের দান অমর।

শিল্প-বাণিজ্যে বাঙালী

লেখক—মারোয়াড়ি ও অন্যান্য অ-বাঙালী ভারতীয়দের তুলনায় বাঙালী শিল্পী-বণিক আলামোহনদের অবস্থা কিরূপ?

সরকার—মারোয়াড়ি ইত্যাদি অ-বাঙালী শিল্পী-বণিকেরা কোটি-কোটি টাকার কারবার করে। বাঙালী শিল্পী-বণিকদের দৌড় হাজার-হাজার পর্য্যন্ত,—বড়-জোড় লাখ-লাখ পর্য্যন্ত। মারোয়াড়ি ও অন্যান্যেরা টাকায় বড় সন্দেহ নাই। কিন্তু তা'ব'লে কর্ম্মবীরত্বের চরিত্রে অ-বাঙালীরা বাঙালীদের চেয়ে বড় নয়।

লেখক—ইংরেজ, জার্ম্মান, মার্কিন ইত্যাদি অ-ভারতীয় শিল্পী-বণিকদের তুলনায় বাঙালী আলামোহনদের অবস্থা কিরূপ?

সরকার—শিল্পের অভিজ্ঞতায় আর গবেষণায় ইংরেজ, জার্ম্মান ইত্যাদি শিল্পী-বণিকেরা আশমানের চাঁদ। বাঙালী আলামোহনেরা এই বিষয়ে কচি-শিশু মাত্র। কিন্তু কর্ম্মবীরের চরিত্র হিসাবে ওরা আমাদের চেয়ে উন্নত নয়। তা'ছাড়া মারোয়াড়ি ইত্যাদি ভারতীয় শিল্পী-বণিকদের মতনই বা চেয়েও অ-ভারতীয়েরা অনেকে পুঁজি-পাটার মাপে যারপর নাই বড়। বাঙালী শিল্পী-বণিকদের ট্যাঁকে টাকা অতি কম। কিন্তু তারা দুনিয়ার হালচাল বেশ-কিছু বুঝে। মারোয়াড়িরাও হাতী-ঘোড়া নয়, ইংরেজ-জার্ম্মানরাও হাতী-ঘোড়া নয়।

লেখক—বর্ত্তমান লড়াই খতম হবার পর বাঙালী শিল্পী-বণিকদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াবে মনে হচ্ছে?

সরকার—অনেক বাঙালী কর্ম্মবীরই পটল তুল্‌বে। লড়াইয়ের আগে যারা কারবারে লেগেছে তাদের কেহ কেহ হয়ত আত্মরক্ষা কর্‌তে পার্‌বে। মারোয়াড়ি ও অন্যান্য অ-বাঙালী কোম্পানীর কোনো কোনোটা দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারবে না, কতকগুলা দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। ইংরেজ ও মার্কিন কোম্পানী

বাঙলাদেশ আর অ-বঙ্গ ভারত ছেয়ে ফেল্‌বে। পৃথিবীর সকল দেশেই লড়াইয়ের সময়কার অনেক কারবার লড়াইয়ের পর দাঁড়িয়ে থাকৃতে অসমর্থ দেখা যাবে।

লেখক—লড়াইয়ের সময়কার কারবারগুলা দাঁড়িয়ে থাকৃতে পারৃবে না কেন ?

সরকার—বিলাত, জার্ম্মানী, জাপান, আমেরিকা ইত্যাদি সকল দেশের লড়াইয়ের কারবারই প্রায় একরূপ। এইসব কারবার গভর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র-স্বরূপ। সরকারী চাহিদা জোগানোর জন্য এইসব কায়েম হয়। সরকার এই সবের জন্য কয়লা, রসদ ও কাঁচামাল জোগায়। সরকারী পুঁজিও এই সকল কারবারের সাহায্যে আসে। আর দরকার হ'লে মজুর জোগাবার ভারও থাকে সরকারী ঘাড়ে। যান-বাহনের ব্যবস্থাও করে সরকার। কারবারগুলা ঠিক যেন সরকারী অফিসের কয়েকটা কর্ম্মকেন্দ্র। এই সবকে সত্যিকার কারবার বলা চলে না।

লেখক—সত্যিকার কারবার কিরূপ ?

সরকার —তাতে কারবারীরা রসদ, কাঁচামাল, পুঁজি, মজুর, যান-বাহন, আর কেনা-বেচা সব কিছুর জন্যই প্রতি মুহূর্ত্ত হায়রাণ-পরেষাণ থাকে। তা'ছাড়া গণ্ডা-গণ্ডা বা ডজন-ডজন কারবারীর পারস্পরিক টক্কর সাম্‌লে চল্‌তে হয় প্রত্যেককে। টক্করে যারা দাঁড়াতে পারে তাদেরকেই বলি কারবারী। টক্করহীন কারবার কারবারই নয়। তার কৃতকার্য্যতাকে স্থায়ী বিবেচনা করা চল্‌তে পারে না।

লেখক—বাঙালী কর্ম্মবীরেরা গুণ্‌তিতে বেড়ে যাবে বল্‌লেন কেন ?

সরকার—এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক আর মিস্ত্রির দল বেড়ে যাবে। কিন্তু পুঁজি-পাটার জোর বাঙালী শিল্পী-বণিকদের হাতে বড় শীঘ্র দেখা যাবে না; কাজেই বহুসংখ্যক বাঙালী কর্ম্মবীরকে ঘায়েল হ'তে হবে। তাতে আপশোষ নাই। তা'সত্ত্বেও বাঙালীর বাচ্চারা শিল্প-বাণিজ্যে দাঁত লাগিয়ে চল্‌তে থাক্‌বে। নয়া-নয়া বাধা-বিঘ্নের ঘাড় মট্‌কাতে লেগে যাবে অনেক বাঙালী বেপারী। অবস্থা-মাফিক ব্যবস্থা কর্‌বার লোকের কৃতিত্ব দেখা যাবে। বড় বড় কারবারের মুরোদ নাই ব'লে বাঙালী আলামোহনেরা হাত গুটিয়ে ব'সে থাক্‌বে না। "ত্যাঁদড়", "ভবঘুরে" আর "ডান্‌পিটে" এই তিনগুণওয়ালা* বাঙালী সর্ব্বদাই শিল্প-বাণিজ্যের আসরে অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় মোতায়েন থাক্‌বে। বঙ্গ-সমাজে কর্ম্মবীরের স্রোত চিরদিন ব'য়ে চল্‌বে।

মারোয়াড়ির বাঙালী-বিদ্বেষ

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, মারোয়াড়িতে আর বাঙালীতে ঝগড়া বেড়ে যাচ্ছে? পরস্পর পরস্পরকে শত্রু বিবেচনা কর্‌ছে না কি?

সরকার—প্রশ্নটা জটিল, বেপারী মারোয়াড়িদের সঙ্গে বেপারী বাঙালীদের টক্কর আর আড়াআড়ি চলে। এই টক্কর আর আড়াআড়ি স্বাভাবিক। কিন্তু গোটা মারোয়াড়ি জাত্‌কে তামাম বাঙালী জাতের শত্রু সম্‌ঝে রাখা ঠিক নয়।

* এই সকল শব্দের জন্য শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত "নয়া বাঙলার গোড়া পত্তন" (১৯৩২) ও "বাড়তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) দ্রষ্টব্য।

লেখক—মারোয়াড়িতে বাঙালীতে বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায় কি ?

সরকার—হাজার-হাজার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের মফঃস্বলে-মফঃস্বলে পাওয়া যায়। বাঙালী-মারোয়াড়ি বন্ধুত্বের অসংখ্য পরিচয় আছে কি জেলায়। তা'ছাড়া কলকাতার নানা পাড়ার লোকই বাঙালী-মারোয়াড়ি বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখ্‌তে পায়।

লেখক—তা'হ'লে মারোয়াড়ির বাঙালী-বিদ্বেষ সম্বন্ধে আজকাল এত বেশী বলা-কওয়া হয় কেন ?

সরকার—বিদ্বেষটা প্রধানতঃ বা একমাত্র বেপারী-মহলে সীমাবদ্ধ। শিল্প-বাণিজ্যে টক্কর অতি ভয়ানক চিজ। কারবারের বেলায় ইংরেজ ইংরেজদের দুস্‌মণি করে, মারোয়াড়ি মারোয়াড়ির দুস্‌মণি করে, বাঙালী বাঙালীর দুস্‌মণি করে। কাজেই বাঙালীরা মারোয়াড়ির দুস্‌মণি কর্‌লে আর মারোয়াড়িরা বাঙালীর দুস্‌মণি কর্‌লে চম্‌কে যাবে কেন ? শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আর প্রতিদ্বন্দ্বীর ধ্বংস সাধন হচ্ছে কারবারী মাত্রের স্বধর্ম্ম।

লেখক—বাঙালীরা মারোয়াড়ি আফিসে কম মাইনে পায় কেন ? মারোয়াড়ি ইত্যাদি জাতের লোকেরা বাঙালী শিল্পী-বণিকদের চেয়ে বেশী কর্ম্মদক্ষ নয় কি ? মারোয়াড়ি ইত্যাদি জাতের লোকেরা বাঙালীকে চাকরী দিলে পঞ্চাশ-পঁচাত্তরের বেশী দেয় না। কিন্তু সেই চাকরীর জন্যই অ-বাঙালীকে শ'-পাঁচেক, এমন কি, হাজার টাকা পর্য্যন্ত দেয়। কেন ? এর মানে কী ? অ-বাঙালীরা বেশী কর্ম্মদক্ষ নয় কি ?

সরকার—জবাব দেওয়া সোজা নয়। হয়ত কিছুটা স্বজাতি-প্রীতি আছে। জলের চেয়ে রক্ত বেশী ঘন। তা'ছাড়া এইরূপ দৃষ্টান্ত কত বলা কঠিন। বোধ হয় কোনো কোনো মারোয়াড়ি বেপারী দেশী-বিদেশী সমাজে নিজের ইজ্জদ বাড়াবার জন্ত প্রধান-প্রধান মারোয়াড়ি কর্ম্মচারীদেরকে উঁচু হারে বেতন দিতে অভ্যস্ত। কিন্তু এসব সার্ব্বজনিক মারোয়াড়ি রেওয়াজ নয়। অপর দিকে সাদাচামড়াওয়'লাদের ব্যাঙ্ক-বীমা ইত্যাদি অফিসেও সাদাদের তুলনায় বাঙালী কেরাণী কর্ম্ম-চারীদের অবস্থা শোচনীয়। তাতে আহাম্মুকেরা ঘাব্ড়ে যায় ও দিশেহারা হ'য়ে পড়ে। কিন্তু বাঙালীর বাচ্চারা সবাই অমন ম্যাড়াকান্ত নয়। মাইনের মাপে কোনো ব্যক্তি বা জাতের কর্ম্মদক্ষতা জরীপ করা যায় না। মাইনে বেশী পায় ব'লেই অ-বাঙালী কর্ম্মচারীরা হাতী-ঘোড়া নয়।

লেখক—মারোয়াড়িদের বাঙালী-বিদ্বেষ এমন হলো কেন?

সরকার—কারণ অতি স্বাভাবিক। ইংরেজরা চায় না যে, ভারতীয় বেপারীরা তাদের সমান হয়। মারোয়াড়ি বেপারীরাও ঠিক তেম্নি চায় না যে, বাঙালী বেপারীরা শিল্প-বাণিজ্যে তাদের সমান হয়। তাদের বিবেচনায় বাঙালীরা এম্. এ., এম্. এস্-সি., পি-এইচ্. ডি., ডি এস্-সি., বি. এল্., ইত্যাদি পাশ কর্‌তে পারে বটে। করুক না পাশ! কিন্তু এরা আর্থিক দুনিয়া বুঝে না। ব্যবসা-বাণিজ্য এদের হাড়ে লাগ্‌বে না। এই ধারণাটা নানা উপায়ে বাঙালীর মেজাজে বসিয়ে দেওয়া ইংরেজের ও অন্যান্ন সাদাদের দস্তুর। মারোয়াড়ি বেপারীদের পক্ষেও এইটে বড় ধাক্কা হওয়া স্বাভাবিক। তা'ছাড়া খাঁটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে

বাঙালীর কারবারকে কুপোকাৎ কর্‌বার জন্য মারোয়াড়িরা হয়ত অনেক কিছু করে। আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। এই বিষয়ে মারোয়াড়িরা আর ইংরেজ একরূপ। এ হচ্ছে ব্যবসার টক্কর। বাঙলা দেশে বাঙালী শিল্পী-বণিকদের কর্তৃত্ব-ও স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার অন্যতম বাধা হচ্ছে মারোয়াড়ি বেপারী।

লেখক—সব মারোয়াড়িই কি এতটা বঙ্গ-শত্রু?

সরকার—কোনো জাতের সব ক'টা লোকই কি কোনো নির্দ্দিষ্ট চরিত্রের হয়? আগেই ব'লেছি, আমি মারোয়াড়িদেরকে বাঙালী জাতের শত্রু বিবেচনা করি না। শুনেছি, কোনো কোনো মারোয়াড়ি খোলাখুলি বলে, "বাঙালী, তোরা রসায়নের এম্‌-এস্‌. সি.ই হ' বা এঞ্জিনিয়ারিংএর পি-এইচ্‌. ডি.ই হ' শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ-পঁচাত্তরের জন্য তোরা মারোয়াড়িদের কেরাণী ছাড়া আর কী? কিন্তু বেপারী বাঙালী ছোক্‌রারা মারোয়াড়িদের সম্বন্ধে অন্য ধরণের সাক্ষ্যও দিতে পারে। তাদের অনেকে মারোয়াড়িদেরকে বাঙালী জাতের গুণগ্রাহী বিবেচনা করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মারোয়াড়ি বেপারীরা বাঙালী বেপারীদের বন্ধু, সহযোগী ও মুরুব্বি।

লেখক—মারোয়াড়িরা বাঙালী লিখিয়ে-পড়িয়েদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কেন?

সরকার—কারণ অতি সোজা পঞ্চাশ-পঁচাত্তর-শ'খানেক টাকা দিয়ে বাঙালী লিখিয়ে-পড়িয়েদের বেঁধে রাখা যায় ব'লে। একে বলে পয়সার গরম। এই কারণেই পয়সাওয়ালা বাঙালীরাও লিখিয়ে-পড়িয়ে বাঙালীদেরকে মুখখু, অপদার্থ, কাণ্ডজ্ঞান-

হীন সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু মারোয়াড়িদের সমাজে আজ-কাল দু'-একজন উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ইত্যাদি পেশার লোক দেখা দিচ্ছে। কাজেই লিখিয়ে-পড়িয়েদের ইজ্জদ ক্রমশঃ মারোয়াড়ি সমাজে বেড়ে চল্‌বে। বোম্বাইয়ের মারোয়াড়িরা ইতিমধ্যেই মারাঠা ও গুজরাটী বিজ্ঞানসেবক, এঞ্জিনিয়ার, অর্থশাস্ত্রী ইত্যাদি লিখিয়ে-পড়িয়েদের ইজ্জদ দিতে সুরু করেছে। বাঙলার মারোয়াড়িরাও অল্প দিনের ভেতরেই বাঙালী এম্. এস্‌-সি., পি-এইচ্. ডি. ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেবকদেরকে সম্মান কর্‌তে থাক্‌বে।

চাই বাঙালীর সঙ্গে মারোয়াড়ির আর্থিক সহযোগ

লেখক—আপনার সঙ্গে মারোয়াড়িদের যোগাযোগ কেমন?

সরকার—এই অধমের সঙ্গে মারোয়াড়িদের ভাব আছে, তাদের সম্বন্ধে আমার সাক্ষ্য নিম্নরূপ। এমন কি ছেলেবেলায়ই মালদহে মারোয়াড়িদের সঙ্গে বাঙালীর সহযোগ দেখেছি। নিজের কথা বল্‌তে পারি। ১৯০৫ সনের যুগে বন্ধুত্ব সুরু। সেই বন্ধুত্ব আজও চল্‌ছে। শুধু মারোয়াড়ি কেন—যে কোনো অ-বাঙালীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত লেন-দেন বন্ধুত্বময়। কারুর সঙ্গে কোনোদিন বনিবনাওয়ের অভাব ঘটেনি। বাঙলা দেশের বহুসংখ্যক অ-বাঙালী আমাকে বেশ বন্ধুভাবে দেখে। আমার অন্যতম প্রিয় বন্ধু ছিল,—জানই তো—কাশীর "বিদ্যাপীঠ"-প্রতিষ্ঠাতা "ভাইয়া" শিবপ্রসাদ। এই ধরণের আরও ভাইয়া আমার আছে অ-বাঙালী ভারতের

নানাকেন্দ্রে। শিবপ্রসাদকে আমি "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" (দুই খণ্ড ১৯৩৫) উৎসর্গ করেছি। অল্প কিছু দিন হলো শিবপ্রসাদ মারা গেছে (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৪)।

লেখক—বাঙালী জাতের পক্ষে মারোয়াড়িদেরকে বয়কট করা উচিত নয় কি?

সরকার—না, উচিত নয়। বরং মারোয়াড়িদের সঙ্গে বাঙালীর সহযোগ চালানো উচিত। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মারোয়াড়িদের সহযোগ না রাখ্‌লে বাঙালী বেপারীদের আর্থিক উন্নতি কঠিন হবে।

লেখক—ব্যবসা-বাণিজ্যেও আপনি মারোয়াড়িদের সঙ্গে বাঙালীদের সহযোগ চান?

সরকার—আলবৎ চাই। অনেক বাঙালী বেপারী মারোয়াড়ির সহযোগিতায় দাঁড়িয়ে আছে। মারোয়াড়ি মহলে যাদবপুর কলেজের এঞ্জিনিয়ারদের সুখ্যাতি আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালীর মারোয়াড়ি-সহযোগিতা আরও বেড়ে যাওয়া উচিত। তা' ছাড়া শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে মারোয়াড়ি-বাঙালী সমঝোতা আর সহযোগ তো বাঞ্ছনীয় বটেই। ছেলেবেলা হ'তেই আমি বাঙলায় হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার পছন্দ করি। হিন্দীর মারফৎ বাঙালীর সঙ্গে মারোয়াড়ির সদ্ভাব কিছু কিছু বেড়ে যাওয়া সম্ভব। এদিকে নজর রাখা উচিত। মারোয়াড়িরা আজকাল বিজ্ঞান-গবেষক, রাসায়নিক, খনি-শাস্ত্রী, এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি লিখিয়ে-পড়িয়েদের কদর বুঝ্‌তে সুরু ক'রেছে। এই সূত্রে মারোয়াড়ি সমাজে বাঙালীর ইজ্জত বেশ কিছু বাড়্‌তে থাকবে।

লেখক—মারোয়াড়ি বল্‌লে আপনি কি বুঝ্‌ছেন?

সরকার—বর্ত্তমান আলোচনায় একমাত্র মারোয়াড় জনপদের লোককে মারোয়াড়ি বল্‌ছি না। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের নরনারীও বুঝ্‌তে হবে। তা' ছাড়া বোম্বাইএর গুজরাতী, বোড়া (মুসলমান), ভাটিয়া, সিন্ধি এই চার জাতও "মারোয়াড়ি" শব্দের অন্তর্গত। এই সাত জাতের লোক এক ধরণের নয়। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী-দেরকে বিশেষতঃ কলকাতায় প্রধানতঃ এদের সঙ্গে টক্কর দিতে হয়। সহজে এক কথায় মারোয়াড়ি নাম দেওয়া গেল। সাময়িকভাবে এ একটা পারিভাষিক মাত্র।

লেখক—মারোয়াড়িদেরকে আপনি বাঙালী জাতের শত্রুও বল্‌ছেন আবার বন্ধুও বল্‌ছেন। বুঝা যাচ্ছে না।

সরকার—দুনিয়া বড়ই জটিল। বাঙালী মাত্রেই বাঙালীর বন্ধু কি কোনো বাঙালী কোনো বাঙালীর শত্রু নয় কি? বড় বড় বাঙালী বেপারিরা ছোট খাটো ছোক্‌রা বা নয়া বাঙালী বেপারিকে হাতে ধ'রে মানুষ কর্‌তে রাজী হয় কি? বাঙালীতে-বাঙালীতে ব্যাঙ্ক-বীমা-বহির্বাণিজ্য-ফ্যাকটারির কারবারে টক্কর চলে না কি? বাঙালীরাই বাঙালীদেরকে ব্যবসাক্ষেত্রে শত্রু ভাব্‌তে অভ্যস্ত। মারোয়াড়িরাও বাঙালী-দেরকে ব্যবসাক্ষেত্রের টক্করের বেলায় শত্রুভাবে দেখে, তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? শত্রুদেরকে ধ্বংস কর্‌বার জন্য যা-কিছু করা আবশ্যক, মারোয়াড়ি বেপারিরা বাঙালী বেপারীদের বেলায় ঠিক তাই করে। এমন কি, এক মারোয়াড়ি আর এক মারোয়াড়ির সঙ্গে কারবারের টক্করে বন্ধুভাবে ব্যবহার করে না, শত্রুভাবেই ব্যবহার করে।

কল্‌কাতার মারোয়াড়িতে মারোয়াড়িতে লড়াই চলে কি কম? ইংরেজ কোম্পানিতে ইংরেজ কোম্পানিতে আড়া-আড়ি বহরে বা আকার-প্রকারে কম কি?

লেখক—আপনার সঙ্গে কোনো মারোয়াড়ির অসদ্ভাব ঘটেনি কেন?

সরকার—সোজা কথা। পেশায় আমি বৈশ্য নই—হয়ত ব্রাহ্মণ। মারোয়াড়িরা বৈশ্য। আমি ব্যাঙ্ক-বীমা-বাণিজ্য-ফ্যাক্টরী ইত্যাদি সংক্রান্ত কারবারের বেপারী নই। এই সকল বিষয়ে মোল্লাগিরি করা আমার পেশা। মামুলি পড়ুয়া লোকের সঙ্গে কোনো বেপারী লোকের শত্রুতা হবে কেন? আমার মতন মামুলি লিখিয়ে-পড়িয়ের কাজকর্ম্মের লক্ষ্য সার্ব্বজনিক স্বার্থ-পুষ্টি। তাতে দেশশুদ্ধ লোকের উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা। এতে মারোয়াড়ি, অ-মারোয়াড়ি, বাঙালী, অ-বাঙালী সকল জাতের আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। আমার সঙ্গে মারোয়াড়িদের কোনো কর্ম্মক্ষেত্রে টক্কর নাই। এই জন্য তাদের পক্ষে আমার বন্ধু এমন কি মুরুব্বি হওয়া সহজ হয়েছে। বৈশ্যরা আমাকে বামুন সম্‌ঝে থাকে—দুধ-কলাও খেতে দেয়।

মারোয়াড়িরা অন্যতম বাঙালী বণিক

লেখক—আপনি তো পাঁচ-সাত রকমের ভারতীয় জাতকে মারোয়াড়ি বল্‌ছেন। খাঁটি মারোয়াড়িদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বল্‌বেন?

সরকার—বাঙলা দেশে আমরা অন্যান্য ভারতবাসীর চেয়ে মারোয়াড়ের লোকজনকে বেশী চিনি। তারাই সত্যিকার মারোয়াড়ি।

এই ধরণের আসল মারোয়াড়িরা বাঙলা দেশের শহরে মফঃস্বলে বসবাস করছে অনেক কাল থেকে। জগৎ শেঠের আমল থেকে—তার আগে থেকেও আজ পর্য্যন্ত মারোয়াড়িরা বঙ্গবাসী, এইজন্য মারোয়াড়িদেরকে আমি অ-বাঙালী বলি না। এরা বাঙালী হ'য়ে গেছে।

লেখক—দেখ্‌ছি—আরেকটা অদ্ভুত রকমের বিনয় সরকারী মত চালালেন। মারোয়াড়িরা অ-বাঙালী নয়—বাঙালী ?

সরকার—তাইতো বল্‌ছি, বাংলাদেশের মারোয়াড়িরা সত্যি-সত্যিই বাঙালী। এরা কথা বলে বাঙলা। অনেকে কাপড়-চোপড় পরে বাঙালী কায়দায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মারোয়াড়ি মেয়েদের শাড়ী বাঙালী শাড়ী, পুরুষেরা কেউ কেউ চালায় বাঙালী কোঁচা, বাঙালী টেড়ী। চব্বিশ ঘণ্টাই এখানে-সেখানে এরা পাগড়ী-শীল নয়। তার উপর মারোয়াড়ি পরিবারে চলে কৃষ্ণ, রাধা, রাম, শিব, দুর্গা, কালী ইত্যাদি দেবদেবীর পূজা-পার্ব্বণ। বাঙালী বৈষ্ণবদের মতন মারোয়াড়ি জাত সাধারণতঃ মাছ-মাংস- ডিমখায় না, তবে দু'চার জন লুকিয়ে-চুরিয়ে সব-কিছুই খায়। কোনো কোনো মারোয়াড়ি ষোল আনা আধুনিক, বিদেশী হোটেলে খেতে ব'সে লুকোচুরি করে না। কাজেই বাঙালীতে মারোয়াড়িতে কোনো প্রভেদ ঢুঁড়ে পাই না। হাড়মাস এদের বাঙালী হ'য়ে গেছে। এদের হাসিঠাট্টা কায়দা-কানুনের অনেক-কিছুই বাঙালী। রোটারী ক্লাবের মারোয়াড়ি সভ্যদেরকে আমার পক্ষে বাঙালী ছাড়া আর কিছু ভাবা অসম্ভব।

লেখক—মারোয়াড়িরা বাঙালীদের কাজে সাহায্য করে কি ?

সরকার—শ'-দেড়-দুই বছর ধ'রে মারোয়াড়িরা বাঙালীর বাচ্চার অসংখ্য প্রকারের কাজকর্ম্মে বাঙালীর বাচ্চার মতনই মেতেছে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সম্বন্ধে বাঙালী জাতের এমন কোনো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দে'খ না যাতে মারোয়াড়ির "ধন-মন-তন" দিয়ে সহযোগিতা দেখা যায় নি। গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লবের সময় (১৯০৫) আর তার পরবর্ত্তী বছর চল্লিশেকের ভেতর মারোয়াড়রা কোন্ আন্দোলনে যুবক বাঙলাকে একলা ফেলে আল্‌গা হ'য়ে রয়েছে? বাঙালীতে মারোয়াড়িতে প্রভেদ আমার চোখে মালুম হয় না।

লেখক—একদম কোনো প্রভেদ নাই ?

সরকার—ভেবে হিসেব ক'রে প্রভেদটা আবিষ্কার করতে হবে। হাঁ, বল্‌বো যে, বিয়ের জন্য মারোয়াড়িরা সময়-সময় বিকানীর পর্য্যন্ত ধাওয়া করে। বাঙালীর সঙ্গে মারোয়াড়ির বিয়ের যোগাযোগ নাই। কিন্তু তাতেও মারোয়াড়ির। অ-বাঙালী প্রমাণিত হয় না।

লেখক—কেন অ-বাঙালী নয় ?

সরকার—বাঙালী মুসলমানেরা কি বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে করে ? বিয়ে-করা-না-করার উপর বাঙালীত্ব নির্ভর করে না। যে কোনো বাঙালী হিন্দু কি যে কোনো বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে করে? বাঙালী সমাজের এই হাজার জাত-পাঁতের অন্যতম জাত-পাঁত হচ্ছে মারোয়াড়ি। বৈদ্যরা বৈদ্যের সঙ্গে বিয়ে করে। কিন্তু তবুও তারা বাঙালী। সাহারা সাহাদের সঙ্গে বিয়ে করে। কিন্তু তবুও তারা বাঙালী।

মারোয়াড়িরা মারোয়াড়ির সঙ্গে বিয়ে কর্‌লে বাঙালী থাক্‌বে না কেন ?

লেখক—আপনি দেখ্‌ছি ভাবিয়ে তুল্‌লেন। দেশশুদ্ধ্‌ লোকে মারোয়াড়িদেরকে অ-বাঙালী বল্‌ছে। আর আপনি বাঙালী সমাজের একটা নয়া জাত আবিষ্কার কর্‌লেন মারোয়াড়িদের ভেতর।

সরকার—কী কর্‌বো, ভায়া ? সকলেই জানে,—আমি আনাড়ি, মুখ্‌খু লোক। আমার বিবেচনায় বাঙালীর মারোয়াড়ি-বিদ্বেষ নেহাৎ যুক্তিহীন। মারোয়াড়িদের ট্যাঁকে পয়সা আছে, এই কারণেই কি বাঙালীর পক্ষে মারোয়াড়ি জাত্‌কে হিংসা করা উচিত ? তা'হ'লে বাঙালীরা তিলি জাত্‌কে হিংসা করে না কেন ? তিলিরাও ত পয়সাওয়ালা জাত্। তাদেরকে হিংসা করা উচিত নয় কি ? সুবর্ণবণিক, সাহা, গন্ধবণিক ইত্যাদি বাঙালী জাত্‌গুলাও ধনী, বাঙালীরা তাদের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন কর্‌ছে না কেন ? যে কোনো পয়সাওয়ালা বাঙালী বৈশ্যকে অ-বাঙালী বলা কিরূপ যুক্তি ?

লেখক—আপনার যুক্তি কী ?

সরকার—আমার বক্তব্য সোজা। মারোয়াড়িরা, গন্ধবণিক, তিলি, সাহা, সুবর্ণবণিক ইত্যাদি পুঁজিশীল বণিক জাতের মতনই অন্যতম বাঙালী বণিক। এরা সবাই বৈশ্য বাঙালী।

লেখক—আপনার মত বাঙলাদেশে চল্‌বে কি ?

সরকার—আমি গরীব মানুষ। আমার কোন্ মতটাই বা চলে ? মারোয়াড়িদেরকে বাঙালী সমাজের অন্যতম শিল্পদক্ষ

ও বাণিজ্যদক্ষ জাত সম্‌ঝে রাখা বিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনুর পক্ষে যার-পর-নাই জরুরি। মারোয়াড়িকে অ-বাঙালী সম্‌ঝে চলা বাঙালীর বাচ্চার পক্ষে চরম আহাম্মুকি। *

লেখক—মারোয়াড়ি সম্বন্ধে আপনার পাঁতি দেখ্‌ছি আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পাঁতির ঠিক বিপরীত।

সরকার—কী করা যাবে? লোকেরা আমাকে গরু ব'লে জানে। যে কোনো পণ্ডিতের বিপরীত-পন্থী হওয়া আমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। একেই বলে গরুমি।

* মারোয়াড়ি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের "নয়া বাংলায় গোড়া পত্তন" (১৯৩২) ও "বাড়তির পথে বাঙ্গালী" (১৯৩৪) দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মবীর আলামোহন-প্রশস্তি

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, কবিরত্ন, বি. এ.

১

বাংলার লালা আলামোহন, শিল্পপতি, কর্ম্মবীর,
কোন ভয়েই নয় সে ভীত, সৎসাহসে উচ্চশির ;
অধ্যবসায়, একাগ্রতা আর সততা মূলধনে,
দেখাইল নিয়ে যে যায় সফলতার ফুলবনে !
পাহাড়-প্রমাণ বিঘ্ন-বাধা পদাঘাতে হয় সিধে,
কুঁড়ের মরণ ব'সে কাঁদা, উদরে তার রয় ক্ষিধে !
একদিকেতে বিদ্যাসাগর, আলামোহন আর এক দিক্,
দারিদ্র্যকে তুচ্ছ ক'রে কঠোর সাধনার প্রতীক্ !
বাণীর সেবার, রমার সেবার তুল্য দু'জন গৌরবে ;
বিশ্ব-ভুবন মুগ্ধ প্রীত মহদ্‌যশের সৌরভে !
কাল যে ছিল ফেরি'য়ালা—কঠোর সত্য, নয় অলীক-
আজ সে বিরাট কলকারখানার পরিচালক ও মালিক !
জাতির ইতিহাসে নাম এ স্বর্ণাক্ষরে রয় লিখা,
আচার্য্যদেব দেছে এঁকে ললাটে তার জয়টীকা !

২

আজ বাঙালী বিশ্বমাঝে নিঃস্ব ত নয় স্ববীর্য্যে,
মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া করছে শিল্প-বাণিজ্যে।
"দাশ-নগরে মরণোন্মুখ তীর্থক্ষেত্র বাঙালীর",
গড়েছে আজ আলামোহন দেশপূজ্য মহাবীর!
কর্ম্ম-পাগল বাধার আগল ভাঙ্‌ল বীর বিক্রমে,
জাগ্‌ল জাতি শ্রমের ডাকে ঝেড়ে জাড্য-বিভ্রমে!
ধন-বলের জন-বলের অভাব ত নেই উদ্যোগীর
উৎপাদিকা শক্তি জাগায় কঠোর সাধন ধীর যোগীর!
ধনে-ধানে, স্বাস্থ্যে-রূপে, শ্রম-শিল্পে, সম্পদে,
বাংলা আবার শ্রেষ্ঠ আসন লবে বিশ্ব-সংসদে!
আলামোহন, দেশের আশা, আলোক তুমি আঁধারে,
স্বাধীনভাবে বাঁচ্‌তে শেখাও, পাড়ী জমাও পাথারে!
তোমার নামে বেকার প্রাণে উদ্দীপনা পা'ক্‌ অশেষ,
"একজাতি ও একসমাজে" শক্তিশালী হ'ক্‌ এ দেশ!

শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা

অধ্যাপক শ্রীবাণেশ্বর দাশ,

বি. এস্; সি-এইচ্. ই (ইলিনয়েস, ইউ. এস্. এ)

শিল্প-সৃষ্টির জন্য কাঁচামাল আবশ্যক। ইহার কতকাংশ ভূপৃষ্ঠ হইতে কতকাংশ ভূগর্ভ হইতে পাওয়া যায়। ভূগর্ভ হইতে নানাপ্রকার খনিজ দ্রব্য ও জ্বালানি পাওয়া যায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে যে সকল পদার্থ পাওয়া যায় তাহাদিগকে প্রধানতঃ এই কয় ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) কৃষিজাত দ্রব্য (২) বনজাত দ্রব্য (৩) জলজাত দ্রব্য (৪) বালু, কাদা, সিমেণ্ট ইত্যাদি।

যে কোন দেশের শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা করিতে গেলে কাঁচামাল সরবরাহের এই সকল গোড়ার কথা সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা আবশ্যক।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে জামশেদপুরে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হয়। সেই সময়েই ভারতে শিল্পোন্নতির সূত্রপাত হয় বলিতে পারা যায়। জামশেদপুরে লৌহের কারখানা স্থাপনের ফলে অনেক সুফল পাওয়া গিয়াছে এবং বহু ছোট ছোট সাহায্যকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতের খনিজ দ্রব্য পরিমাণে যথেষ্ট নহে, এবং তাহা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য দেশের খনিজ দ্রব্যের মত উত্তমগুণসম্পন্ন নহে, কিন্তু তাহা জাপানের খনিজ দ্রব্য অপেক্ষা নিঃসন্দেহে উত্তম। ভারতবর্ষের ভূগর্ভে বহু পরিমাণ লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ও য়্যালুমিনিয়ামের উপাদান আছে এবং সেই উপাদান হইতে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ও য়্যালুমিনিয়াম তৈয়ারী করা যায়। যতটা সম্ভব অল্প মূল্যে লৌহ

ও ইস্পাত প্রচুর পরিমাণে না পাইলে কোন দেশই শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে না। কারণ, যে কোন জিনিষ তৈয়ারী করিতে গেলে লৌহ ও ইস্পাত আবশ্যক। ভারতবর্ষে তামা, দস্তা ও সীসার উপাদান অধিক নাই। তামা ও সীসা তৈয়ারীর জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু কোন সন্তোষজনক ফল হয় নাই।

ধাতব শিল্পের একটা অংশ রাসায়নিক শিল্প। ভারতবর্ষে ধাতব শিল্পের সম্যক্ উন্নতি না হওয়ায় তাহার রসায়ন-শিল্পও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই। ভারতের রসায়ন-শিল্প এখনও শৈশবাবস্থায় আছে।

মৌলিক শিল্পের তালিকার মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের বিশিষ্ট স্থান আছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রকার শিল্পের উন্নতি সস্তাদরে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের উপর নির্ভর করে। কৃষি ও যানবাহনের সমুন্নতি সস্তা বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে সোভিয়েট রাশিয়া ও জাপানের যে দ্রুত আর্থিক সমুন্নয়ন সম্ভব হইয়াছিল তাহার কারণ অল্পব্যয়ে বৈদ্যুতিক শক্তির সুবিধা লাভ। বিশ্ববিখ্যাত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে ১৯২০ সালে পঞ্চদশ বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া সমস্ত দেশকে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষে জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে। এদেশে এই সুযোগ-সুবিধার শতকরা বোধ হয় দুইভাগ গ্রহণ করা হইয়াছে।

জল অপেক্ষা কয়লার খনিতে আরও অল্প ব্যয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যায়। এখন এদেশে কয়লা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হয় এবং সে জন্য বহু ব্যয়ে কয়লার খনি হইতে

দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়লা চালান দিতে হয়। কাজেই কয়লার খনিতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইলে খরচ কম হইবে এবং তাহা দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করাও যাইবে। ৭৫০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে কয়লা বিশ্লেষণ (carbonisation) করিলে বৈদ্যুতিক শক্তি ছাড়া অনেকগুলি আনুষঙ্গিক পদার্থ পাওয়া যাইবে এবং সেগুলিও অনেক রাসায়নিক শিল্পের মূল উপাদান হইবে।

কৃষিজাত, বনজাত ও জলজাত দ্রব্যের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে বলা যায়—ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধিশালী দেশ। কৃষিজাত, বনজাত ও জলজাত কাঁচামাল সদ্ব্যবহার করিলে ভারতবর্ষে শিল্পের সম্যক্ উন্নতির সম্ভাবনা অধিক। ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত শিল্পের যতটুকু উন্নতি লক্ষিত হইতেছে তাহার বেশীর ভাগ ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল। আজ পর্য্যন্ত কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনার উপর নির্ভর করিয়া শিল্প অগ্রসর হয় নাই। পাট শিল্প হইতেই বাংলা তথা ভারতের শিল্পের সূত্রপাত। গঙ্গার উভয় তীরে এই শিল্প কেন্দ্রীভূত ছিল। পরে ভারতের অপরাপর অংশে, যেমন বোম্বাই, আহ্‌মেদাবাদ, নাগপুর, কানপুর প্রভৃতি স্থানে বড় বড় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যথেষ্ট উন্নতিও করিয়াছে। বড় বড় শিল্প দেশ হইতে যে পরিমাণ কাঁচামাল, শ্রমশক্তি ও অর্থ আকর্ষণ করে, তাহাদিগকে সেই পরিমাণে দেশীয় ও জাতীয় বলা যায়। ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য এদেশেই বাজার আছে, কিন্তু পাটশিল্পজাত দ্রব্যের জন্য তেমন বাজার নাই। পাটশিল্পজাত দ্রব্যের বেশীর ভাগই বিদেশে বিক্রয় হয়। যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, শিল্প-সম্পর্কীয় উপদেশ ও মূলধনের জন্য পাটশিল্পকে বৈদেশিক সরবরাহের উপর নির্ভর করিতে হয়।

সুচিন্তিত পরিকল্পনার উপর শিল্পোন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিয়া চলিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই সময় সকল শিল্পপতি

ও শিল্পোন্নতিকামীর সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত শিল্পের দিকে শক্তি ও মন নিবিষ্ট করা উচিত। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠার সংখ্যা হইতে এদেশের কৃষি-সম্পদের একটা ধারণা জন্মিতে পারে।

ভারতবর্ষের কৃষি-পদ্ধতি এখনও আদিম অবস্থায় আছে। শিল্পের পক্ষে উপযুক্ত অথচ যথাসম্ভব কমদামী ও উৎকর্ষসম্পন্ন কৃষিজাত কাঁচামাল উৎপন্ন করিতে হইলে চাষ-আবাদের ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী প্রয়োগ করা দরকার। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠার সংখ্যা-তালিকা বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, চাউল ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী শস্য এবং শুধু বাংলা দেশে ভারতবর্ষের উৎপন্ন চাউলের এক চতুর্থাংশ উৎপন্ন হয়। চাউল প্রধানতঃ মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

ভাঙ্গা চাউল বা ক্ষুদ হইতে শ্বেতসার (starch) প্রস্তুত হয়। মদ (alcohol)-প্রস্তুতি কার্য্যেও ক্ষুদ কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। ভুট্টার শ্বেতসারেরই চলন অধিক এবং ইহা হইতেও কম খরচে মদ তৈয়ারী করা যায়। কাজেই মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহারের জন্য চাউল সংরক্ষিত থাকিতে পারে। গমের ব্যাপারেও সেই একই কথা।

প্রকার, গুণ ও মূল্যের দিক্ দিয়া বিচার করিলে চাউলের পরেই তৈলবীজের স্থান। ভারতবর্ষে প্রায় পাঁচ শত রকম তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ১২৫ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হয় এবং ইহার মূল্য প্রায় ১২৫ কোটি টাকা। এই বিশাল পরিমাণ তৈলবীজের মধ্যে মাত্র ১৪ রকম তৈলবীজ শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, বাকী সব বাজে নষ্ট হয়। কাজেই এত অধিক পরিমাণ দরকারী কাঁচামাল কাজে লাগাইবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তৈলশিল্পের পরিবর্দ্ধন আবশ্যক, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। ভারতবর্ষে তৈলবীজ এখনও আদিম উপায়ে কাজে লাগান হয়। তবে সম্প্রতি

শস্যের নাম	কর্ষিত ভূমির পরিমাণ লক্ষ একর	উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ লক্ষ টন		মূল্য কোটি টাকা		বাংলার শতকরা পড়তা
	ভারতবর্ষ	ভারতবর্ষ	বাংলা	ভারতবর্ষ	বাং	
চাউল						
তৈলবীজ						
গম	৩৫০					
আখ	৪০			৫৪	৪	১০
				৫২	০৫	'০৯
ভূট্টা				৩১		১'১৮
				২৮'৩৫		৮৩'৩
		২৪'৮	'৩৬	১৯		১'৪৫
তামাক	২'৩	৭'৩৮	১'৮	১৫	৩'৬	২৪'৪
চা						

কিছুদিনের মধ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রচলন হইয়াছে এবং তৈলবীজ হইতে নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

তৈল-নিষ্কাশনের পর যে খইল পাওয়া যায় তাহা জমিতে সার দেওয়ার পক্ষে বেশ কাজে লাগে। জমিতে খইল দিলে জমির শস্য-উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। খইলে প্রচুর পরিমাণে হিউমাস (humous) ও অন্যান্য সারবান্ পদার্থ থাকায় খইল সহজে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। হিউমাসশূন্য রাসায়নিক সার ভূমির পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক নহে। সেইজন্য হিউমাস অথবা হিউমাসসম্পন্ন অন্যান্য সারবান্ পদার্থ সহযোগে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়। যে সব খইলে নাইট্রোজেন, পটাস ও ফস্‌ফেটস্ থাকে না বা কম থাকে সে সব খইল রাসায়নিক সারের সহিত মিশাইয়া জমিতে প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। রাসায়নিক সারের সহিত মিশ্রিত করা হউক বা না হউক তৈলবীজের খইল প্রয়োগ করিলে ভারত-বর্ষের ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইবেই এবং তাহাতে উৎপন্ন শস্য পরিমাণে ও গুণে উৎকর্ষ লাভ করিবেই। ভূমি হইতে উৎপন্ন খইল ভূমিতে মিশিয়া গিয়া ভূমির পূর্ণতা সম্পাদন করিবে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খইল প্রয়োগ করিলে ভারতের কৃষি উন্নত হইবে। শুধু ইহাই নহে, তাহাতে আনুষঙ্গিক শিল্পও সমৃদ্ধ হইবে। তৈলবীজ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের সম্বন্ধে একটা ধারণা পরবর্ত্তী চিত্র হইতে পাওয়া যাইবে।

তৈলবীজ ব্যতীত আর এক জাতীয় দ্রব্য হইতে শিল্পকার্য্যে ব্যবহারের উপযুক্ত খাদনীয় ও অখাদনীয় চর্ব্বি পাওয়া যাইতে পারে। এই দ্রব্য হইতেছে প্রাণীদেহ। দুই উপায়ে প্রাণীজ চর্ব্বি পাওয়া যায়—প্রথম, গবাদি পশুর দুগ্ধ হইতে, দ্বিতীয়, ঐ সকল জন্তু ও তিমি, হাঙ্গর প্রভৃতি জলচর প্রাণীর দেহ হইতে।

তৈলবীজ
(তিসি, সরিষা, তিল, নারিকেল, বাদাম, কার্পাস, রেড়ী, মহুয়া, পোস্ত ইত্যাদি)
চর্ব্বি
খইল
পরিস্রুত চর্ব্বি
সাবানের উপাদান
সার
(নাইট্রোজেন, পটাস,
ফস্‌ফরাস, হিউমাসযুক্ত)
গবাদির খাদ্য
অদনীয় চর্ব্বি
শিল্পে ব্যবহার্য্য চর্ব্বি
তরল চর্ব্বি
ঘনীভূত চর্ব্বি
তরল চর্ব্বি
ঘনীভূত চর্ব্বি
ষ্টিয়েরিণ
মার্গারিণ
(মাখনের পরিবর্ত্ত)
কৃত্রিম ঘৃত
অ-শুষ্ক
অর্দ্ধশুষ্ক
শুষ্ক
সাবান
লুব্রিকেটর
ঔষধ
রঙ
ভার্ণিস্‌
ছাপাইবার কালি
তেলা কাপড়
ষ্টিয়েরিণ (বাতি)
সাবান
লুব্রিকেটর
ঔষধ
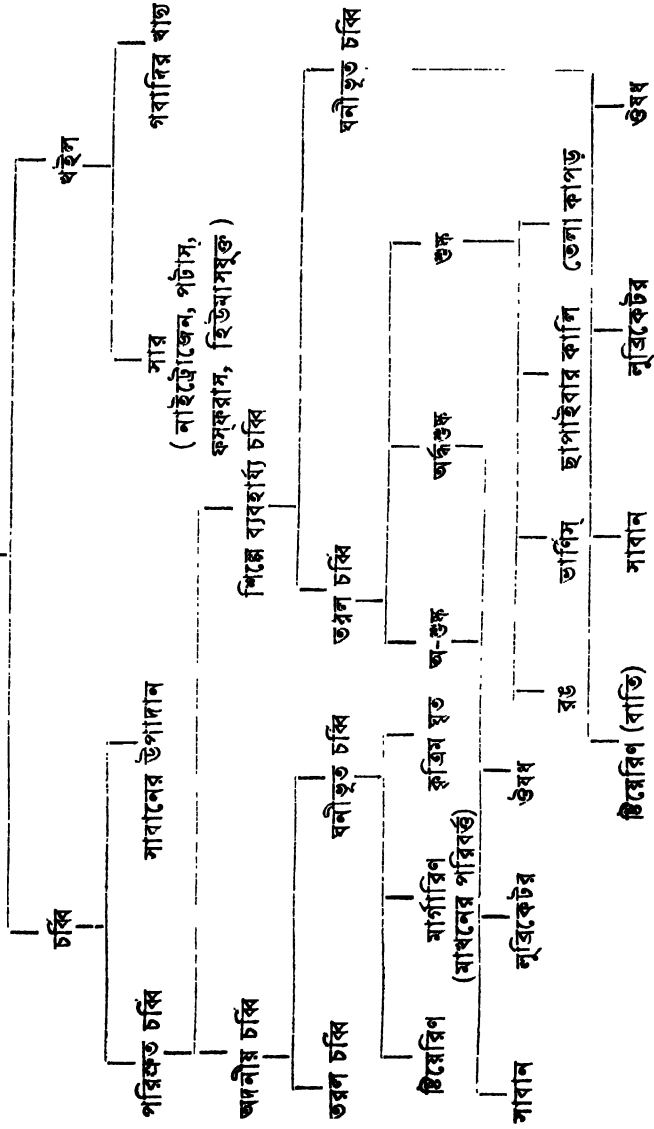
ভারতবর্ষে ৭০০,০০০,০০০ গরু-মহিষ আছে এবং এই বিষয়ে পৃথিবীতে ভারতবর্ষের স্থান প্রথম। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত দেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান ভারতবর্ষের পরে, কিন্তু সেখানে মাত্র ১৭৫,০০০,০০০ গরু আছে। তবে ভারতের গরু যুক্তরাষ্ট্রের গরু অপেক্ষা নিঃসন্দেহে নিকৃষ্ট। প্রজনন ও খাদ্য বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী প্রয়োগ করিলে ভারতের গবাদি প্রভূত পরিমাণে উন্নত হইতে পারে।

ভারতের গবাদি হইতে যে দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি পাওয়া যায় তাহার মূল্য ও হংসমোরগাদির মূল্য ৫০০ কোটি টাকার অধিক। এদেশের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির কথা বিবেচনা করিতে গেলে গো-মহিষাদির উন্নতির বিষয় চিন্তা করা দরকার। ভারতের গবাদি হইতে উৎপন্ন ঘৃতের মূল্য বাৎসরিক ১০০ কোটি টাকার অধিক।

গো-মহিষাদি জীবিত অবস্থায় শুধু যে দুধ-ঘি সরবরাহ করে তাহা নহে, চাষাবাদের কাজে লাগে, গাড়ী টানে। ঐ সকল জন্তু মরিয়া গেলে চামড়া, হাড় পাওয়া যায়। চামড়া হইতে নানাবিধ আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আর হাড় জমিতে সার দেওয়ার কাজে লাগে। আমাদের দেশে চর্ম্মশিল্পও এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বেশ দ্রুত উন্নত হইতেছে। গো-মহিষাদি হইতে প্রাপ্ত শ্রম, দুগ্ধ, ঘৃত, চর্ম্ম, অস্থি প্রভৃতির মোট মূল্য প্রায় ১২০০ কোটি টাকার অধিক হইবে। পরবর্ত্তী চিত্র হইতে দুগ্ধোৎপন্ন দ্রব্যের ধারণা জন্মিবে।

উপরে বলা হইয়াছে, তৈলবীজ হইতে ও গো-মহিষাদির দুগ্ধ হইতে চর্ব্বি পাওয়া যায়। এখন জলজ প্রাণী হইতে প্রাপ্ত চর্ব্বির কথা আলোচনা করা যাইতেছে। ভারতবর্ষে নদী, হ্রদ, ঝিল, পুকুরের অপ্রাচুর্য্য নাই এবং ইহার দুই-তৃতীয়াংশ সমুদ্র ও মহাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। বলা বাহুল্য—এই সমস্ত জলাশয়ে মৎস্য, হাঙ্গর

প্রধানতঃ গরু ও মহিষের দুধ
সর
মাখনতোলা দুধ
চর্ব্বি
ঘোল
দই, খোয়া
ছানা
ছানার জল
ঘি
মাখন
ল্যাকটোস্
(দুধের চিনি)
ঘোল
ঘনীভূত দুধ
দই, খোয়া ইত্যাদি
প্ল্যাষ্টিক
আঠা
আঁশ
ঔষধ
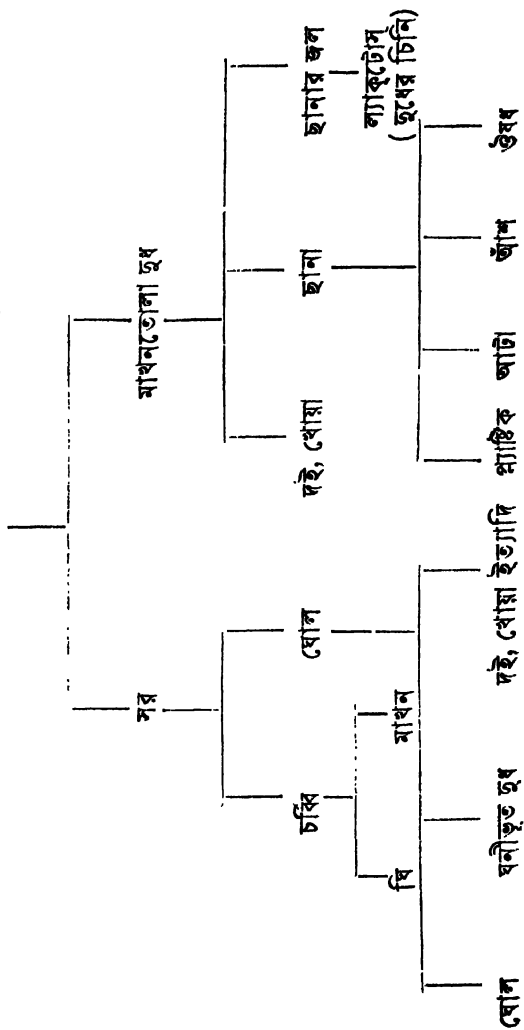
ও তিমি প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের জন্তু আছে এবং এই সমস্ত জন্তু হইতে তৈল, চর্ব্বি পাওয়া যাইতে পারে। কোন কোন চর্ব্বি মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, আর অন্যান্য চর্ব্বি শিল্পকার্য্যে (যেমন, বাতিপ্রস্তুতি, পাট নরম করা, লুব্রিকেটর তৈয়ারী ইত্যাদি) ব্যবহৃত হইতে পারে। জলজ প্রাণীর দেহ হইতে কেবল যে চর্ব্বি পাওয়া যাইবে তাহা নহে। চর্ব্বি নিষ্কাশনের পর এক প্রকার খইল পাওয়া যাইবে। এই খইলে যথেষ্ট হিউমাস থাকে, এবং সেইজন্যই ইহা জমির উত্তম সার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কাজেই জলজ প্রাণীর সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে ভারতের ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা যায়। মৎস্য যে মানুষের পুষ্টিকর খাদ্য, ইহা বহু দিন হইতে পরীক্ষিত আছে। জলজ প্রাণীর দেহ হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যের ধারণা পরবর্ত্তী চিত্র হইতে জন্মিতে পারে।

তৈলবীজ, প্রাণীর দেহ ও প্রাণীর দুগ্ধ হইতে প্রাপ্ত খাদনীয় ও অখাদনীয় উভয় প্রকার চর্ব্বির মূল্য নির্দ্ধারণ করিলে দেখা যায় ইহার মূল্য ৩০০ কোটি টাকার উপর অর্থাৎ উহা ধান্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক এবং এই কারণে চর্ব্বি-শিল্প এদেশের এক মূল্যবান্ শিল্প। কৃষিজাত অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্বে লিখিত চিত্রে পাওয়া যাইবে।

বনজাত সম্পদে ভারতবর্ষের স্থান অনেক উচ্চে। সর্ব্বপ্রকার গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে ও আসবাবপত্রাদি প্রস্তুতি ব্যাপারে আবশ্যক উপযুক্ত কাঠ ভারতের বনজঙ্গলেই পাওয়া যাইতে পারে। ভারতের অরণ্যে বহু রকমের উৎকৃষ্ট সেলুলোস-সম্পন্ন উপাদান আছে। হিমালয়ের পাদদেশে সহস্র সহস্র মাইল জুড়িয়া অরণ্য আছে। ইহা ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন অংশে নানা পাহাড়-পর্ব্বতের পাদদেশে ও শিখরে বহু অরণ্য আছে। এই সব অরণ্য শাল, সেগুণ, বাঁশ, ঘাস ও অন্যান্য বহুবিধ গাছগাছড়ায় পূর্ণ। আরাকান অঞ্চলে পর্ব্বতের উপর

জলজ প্রাণী
(মৎস্য, হাঙ্গর, তিমি, কুম্ভীর ইত্যাদি)
চর্ব্বি
খইল (সাররূপে ব্যবহার্য্য)
তরল চর্ব্বি
ঘনীভূত চর্ব্বি
রং
ভার্ণিস
তেলাকাপড়
সাবান
ঘনীভূত চর্ব্বি
খাদনীয়
শিল্পে ব্যবহার্য্য
মার্গরিণ
মাখনের পরিবর্ত্ত
বাতি
সাবান
গ্রীজ্
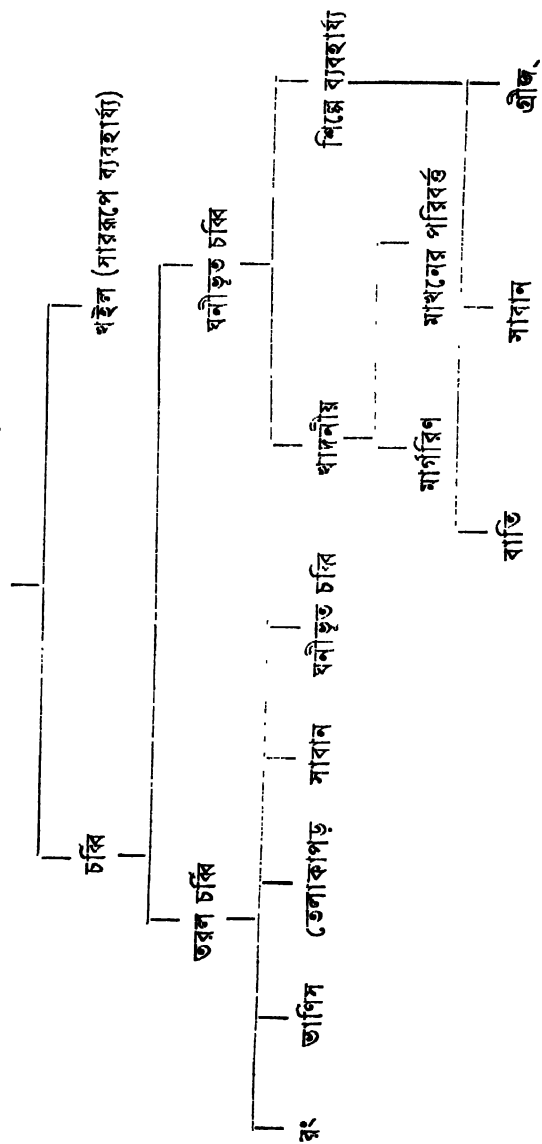
প্রায় ৯০০০ বর্গ মাইল বাঁশজঙ্গল আছে। ইহা ব্যতীত দেশের অন্যান্য স্থানে বহু বাঁশজঙ্গল আছে। ৪ বৎসরের মধ্যে বাঁশ পাকে এবং একবার বাঁশ রোপণ করিলে প্রতি বৎসর বাঁশঝাড় হইতে বাঁশ পাওয়া যায়। যে সব নীচু ও সিক্ত স্থানে অন্যান্য শস্য জন্মে না সেই সব স্থানে বাঁশ জন্মে। বাঁশ গৃহাদি নির্ম্মাণকার্য্যে একান্ত আবশ্যক। বাঁশে প্রচুর পরিমাণে সেলুলোস আছে। সেলুলোস হইতে কাগজ, নাইট্রো-সেলুলোস, নাইট্রো-ভাল্‌সপার, কৃত্রিম রেশম এবং অন্যান্য বহু আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ভারতে বৎসরে প্রায় ৫ কোটি টাকার কৃত্রিম রেশম, ৪ কোটি টাকার কাগজ এবং ৬০ কোটি টাকার কাপড় আমদানী হয়। বাঁশ ব্যতীত আমাদের দেশের আরও বহু জিনিষ [যেমন কার্পাস, পাট ও বীজের বাজে অংশ, ঘাস (এসপার্টো, উলা, সাবাই ইত্যাদি), কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি] হইতে সেলুলোস পাওয়া যায়। এখন যে-সব জিনিষ বাজে নষ্ট করা হয় অথবা জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা হয় তাহাদের মধ্যে অনেক জিনিষ ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে সেলুলোস পাওয়া যাইতে পারে।

ভারতের বনসম্পদ্ এখনও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। ইংল্যাণ্ড আমেরিকা ও অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে সেলুলোস-শিল্প বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ সব দেশের বনজ সম্পদ্ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে, ফলে ঐ সব দেশের বনজ সম্পদ্ শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন ঐ সব দেশের বনজ সম্পদ্ রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য নানাপ্রকার আইন-কানুনের ব্যবস্থা হইয়াছে। জানা যায়, জঙ্গলের গাছ কাটিবার নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ব্বে চারা গাছ রোপণ করিতে হয়। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলির ব্যবসায়ীরা সেলুলোসসম্পন্ন কাঁচা মাল আহরণের জন্য ভারত ও অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বাঁশজঙ্গলের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে।

ভারতবর্ষে পাট, কার্পাস, সিমূল, রেশম, তসর, এণ্ডি প্রভৃতি কতকগুলি আঁশজাতীয় জিনিষ আছে। এই সকল দ্রব্য হইতে কাপড়-চোপড়, থলে, পোষাক প্রভৃতি তৈয়ারী হইতে পারে। বনজাত ও আঁশজাতীয় সম্পদের মূল্য কয়েক সহস্র কোটি টাকা। আজ পর্য্যন্ত এই সকল কাঁচা মালের তেমন সদ্ব্যবহার হয় নাই। এই সকল কাঁচা মাল ব্যবহারের গবেষণার জন্য ভারত-সরকার দেরাদুনে একটি গবেষণা-ও পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়াছেন। এই গবেষণাগারের ফল সন্তোষজনক হইতেছে। এই জাতীয় গবেষণাগার দেশে অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক এবং ভারতীয় ধনপতিদেরও গবেষকদিকের গবেষণার ফল কার্য্যে পরিণত করার জন্য অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। ভারত-সরকার কানপুরে শিল্প-সম্বন্ধীয় গবেষণাগার ও পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে প্রধানতঃ তৈল ও চর্ব্বি সম্পর্কে গবেষণা চলিতেছে। চিনি-শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য কানপুরে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশের কেরালা সাবান কারখানায় আর একটি পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কালিকটে মৎস্যচাষ সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। বাংলার যাদবপুর কলেজে তৈলশিল্প সম্বন্ধে গবেষণা হয়। বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্প সম্পর্কে গবেষণার জন্য যথাক্রমে বোম্বাই ও কলিকাতায় পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে Ceremic শিল্প (অর্থাৎ গ্লাস, পোরসিলেন ইত্যাদি) সম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। যুদ্ধ সম্পর্কীয় বিবিধ শিল্প বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশের নানাস্থানে পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালোর বিজ্ঞান-মন্দিরেও নানাবিষয়ে গবেষণা চলে। কলিকাতার পাগলাডাঙ্গায় যে চর্ম্মশিল্প-বিদ্যালয় আছে সেখানে চর্ম্মশিল্প সম্বন্ধে অনেক নূতন জিনিষ উদ্ভাবিত হইয়াছে।

এই চিত্র হইতে আমাদের বনজ সম্পদ্ সম্পর্কে ধারণা জন্মিবে।
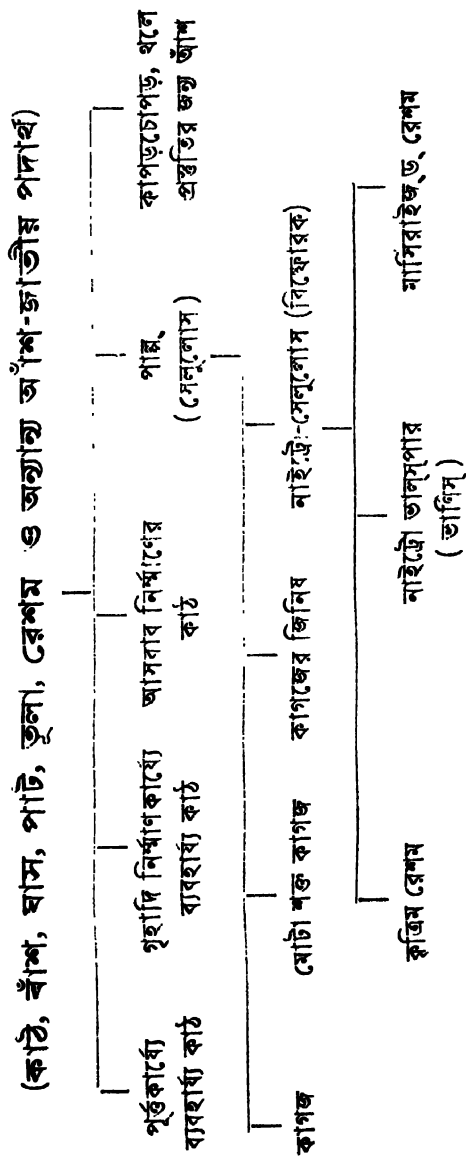
কর্ম্মযোগী আলামোহন

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর, বি. এ.

এই যে অলস দাসত্বলোভী
পরপদসেবী বাঙ্গালী জাতি,
পরদেশী বুলি পুঁথি-খাতা খুলি'
করে মুখস্থ দিবস-রাতি,
বেকার বসিয়া একার অন্ন
দশে মিলে খাওয়া যাদের পেশা
পুঁজি যাহাদের জাতের বড়াই
পাশার লড়াই, চায়ের নেশা,
শিক্ষারে যারা ধিক্কার দিয়া
ভিক্ষারে শুধু জেনেছে শ্রেয়ঃ,
ঝরে যে কর্ম্মে দেহের ঘর্ম্ম
তারে মনে করে অধম হেয়,
এ হেন বাঙালী জাতির মাঝারে
কে তুমি আসিলে ভুলিয়া পথ,
নূতন জীবন সঞ্চার করি'
দেখাইলে তারে নব জগৎ।

নৈরাশ্যের গভীর আঁধারে
চারিদিক যবে ডুবিয়া যায়,
মসী-কলঙ্ক ঘুচায়ে জাতির
শশি-চন্দ্রিকা জাগালে তায়।
তুমিই শিখালে পরসেবা তরে
নয় বাঙ্গালীর বুকের লোহ,
তুমিই ঘুচালে অবোধ জাতির
শতকরা সাড়ে তিনের মোহ।
কর্ম্মযোগের হবি আহরিলে
ধরণী-ধেনুরে দোহন করি',
নবীন ইন্দ্রপ্রস্থ গড়িলে
নব খাণ্ডব দাহন করি'।
নিয়তির সাথে যুঝিয়া নিত্য
পুরুষকারেরে করিলে জয়ী।
ভাগ্যের যূপে বদ্ধ পশুর
বুকে আশ্বাস আনিলে বহি'।
নিরুদ্যমের বক্ষে জাগালে
বীরোদ্যমের উদ্দীপনা,
তোমার জীবনই জাতীয় জীবনে
নব-নাট্যের প্রস্তাবনা।

সোণার স্বপন দেখে যারা শুধু
খুঁজে পথে পথে পরশমণি,
শিখালে তাদেরে লোহার বুকেই
করে প্রতীক্ষা সোণার খনি।
এ মূঢ় জাতির মুখের অন্ন
পাঁচভূতে মিলে লুটিয়া খায়,
ভূত তাড়াবার মন্ত্রটি জানো
ওগো ওঝা তুমি শিখাও তায়।
বক্তৃতা দেশে অনেক হয়েছে
ভাঙিয়া গিয়াছে অনেক গলা,
অনেক কলমই ভোঁতা হয়ে গেছে
হয়েছে কাগজে অনেক বলা।
একটি ইঞ্চি উঠেনিক দেশ,
ফুরায়ে গিয়াছে কথার দিন,
কাজের বেলায় সবাই পলায়
শোধ করি' বাগ্দেবীর ঋণ।
কোথা ছিলে তুমি অখ্যাতনামা
পথে পথে খই করিতে ফেরি,
বাণীর তক্মা করনিক লাভ
বাজেনি তোমার উদয়-ভেরী।

জনতার মাঝে বলিলে উচ্চে
"কে আসিবে এস আমার সাথে,
বাঙালী জাতির পরিত্রাণের
উপায় রয়েছে আমার হাতে।"
কর্ম্মযজ্ঞে আহিতাগ্নিক
সেই হ'তে তুমি কর্ম্মবীর,
সহস্র বাধাবিঘ্নের মাঝে
তুলিয়া রয়েছ উচ্চশির।
আজিকে আমরা চাহি নাক আর
বাক্‌সম্বল নেতার পানে,
দীক্ষা যে চাই তোমার মতই
কর্ম্মযোগীর সন্নিধানে।
যন্ত্র যেখানে প্রভু হয় লোকে
তখনই টানে যে তাহার রথ,
যন্ত্রদানবে মন্ত্রে ভুলায়ে
দেখাইলে তুমি মুক্তিপথ।
দেশভরা লতাগুল্মের মাঝে
তুমিই অগ্নিগর্ভ শমী,
হে নবযুগের বিশ্বকর্ম্মা
নিস্বতারণ তোমারে নমি।

সন্ধ্যার কুলায়,
টালিগঞ্জ।

কর্মবীর আলামোহন দাশ

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, এফ্. আর. এস.

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়ং কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য প্রকাশ্যাত্মশক্তিং
যদি ন সিধ্যন্তি কোঽত্র দোষঃ॥

"লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষসিংহকে ভজনা করেন। কাপুরুষরাই বলে যে (ভাগ্য) দৈব হইতে আসে। দৈবকে অগ্রাহ্য করিয়া, এবং আত্মশক্তি প্রকাশ করিয়া যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহা হইলে দোষ কি?"

কর্মবীর আলামোহন দাশ নিজের জীবনে এই মহাবাণীকে 'মূর্ত্ত' করিয়াছেন। তিনি উদ্যোগী পুরুষসিংহ, কপালে কি লেখা আছে, তাহার উপর ভরসা করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া রহেন নাই। 'আত্মশক্তি' প্রকাশ করিয়া মহান্ শিল্পায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিলুপ্ত সরস্বতী নদীর চড়ার উপর দাশনগরের যে বিশাল যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার একটা বিরাট ভবিষ্যৎ আছে। ভারতীয় সভ্যতার অধঃপতনের সুরু হয়, যে দিন "মনু মহারাজ" ব্রহ্মার দোহাই দিয়া হস্তের ও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার মধ্যে যোগাযোগ বিলুপ্ত করিয়া দেন, যে দিন পাণ্ডিত্যাভিমানী কুসংস্কারের দালালদিগকে সমাজের উচ্চতম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়, হস্তজীবী-দিগকে নিম্নতম শ্রেণীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। হস্ত ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগাযোগ সংস্থাপনের ফলেই বর্ত্তমান বিরাট যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে পুনরায় এই যোগাযোগ সংস্থাপন করিতে হইবে। কর্মবীর আলামোহন এই সংস্কারে বাঙ্গলাদেশে পুরোবর্ত্তী, তাঁহার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

আলামোহন

বিমলচন্দ্র ঘোষ

আশ্চর্য্য মানুষ তুমি অদম্য প্রাণের পরিচয়ে
মূর্ত্তিমন্ত কর্ম্মযোগী, সারাদেশ তাই সবিস্ময়ে
তোমার কীর্ত্তিতে মুগ্ধ। হে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর পূজারী,
অসামান্য প্রতিভায় বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী
শিল্পী তুমি, স্রষ্টা তুমি, একনিষ্ঠ তুমি কর্ম্মবীর,
স্বদেশের গর্ব্ব তুমি যন্ত্রময়ী বিংশ শতাব্দীর।
তব যজ্ঞবেদীগর্ভে অফুরন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার
সুপ্তিহীন ভ্রূণরাশি অগ্নিময় গলন্ত লোহার
অগণিত যন্ত্রশিশু মুক্তি চায় দেশের মাটিতে,
শ্রমিকের শ্রমখড়্গে বৈদেশিক মূল উৎপাটিতে
শোষণের শতশাখা বাণিজ্য-বৃক্ষের। তুমি তাই
চুল্লীভরা উড়ায়েছ নৈষ্কর্ম্ম্যের নৈরাশ্যের ছাই
স্বদেশী মেসিন-শিল্প-সঞ্জীবনী জীবনের গানে
জাগায়ে নবীন আশা, নবোৎসাহ, স্বজাতির প্রাণে।

কপর্দ্দকশূন্য হ'য়ে নাগরিক জনারণ্য-মাঝে
ভ্রমণ করেছ একা ভাগ্যান্বেষী বণিক্-সমাজে
আগ্নেয় উচ্চাশা লয়ে। মনে ছিল অমেয় বিশ্বাস
বাণিজ্য-বিমুখ দেশে রচিবে নূতন ইতিহাস
নব নব সম্ভাবনা উদ্দাম যান্ত্রিক অভিযানে
মন্ত্রমুগ্ধ চিত্ত তব ঐস্পাতিক প্রগতির গানে
তন্দ্রাহীন রাত্রিদিন। [দীর্ঘজীবী হও সিদ্ধকাম,
জগতের যন্ত্রশিল্পে শ্রেষ্ঠ কর বাঙ্গালীর নাম।

তোমার বলিষ্ঠ হাতে লোহার হাতুড়ী হ'ল সোণা,
শ্রমশিল্প-দেবালয়ে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর আনাগোনা,
কঠিন ইস্পাতে লক্ষ স্ফুলিঙ্গের জ্যোতির্ম্ময় শিখা
স্বেদসিক্ত ভালে তব আঁকে নিত্য-গৌরবের টীকা—
প্রতিভার পুণ্য-দ্যুতি। হে যান্ত্রিক প্রগতি-সাধক
পরাধীন স্বপ্নজীবী স্বদেশের কর্ম্মের পাবক,
আলস্যের অন্ধকারে সপ্ত কোটি বঙ্গের সন্তান
তব রুদ্রগানে আজ ধরুক মিলিত ঐক্যতান,
বক্তৃতার মঞ্চ ছেড়ে শত শত নিশেষ্ট বাচাল
দিকে দিকে বহুজন-কল্যাণের জ্বালুক মশাল,
সাম্যগানে মুখরিত স্বদেশের মুক্তজনগণ,
ভুবন করুক আলা কর্ম্মে তব হে আলামোহন।

কর্ম্মবীরের শক্তি-উৎস

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী

দার্শনিক এমার্সন সাহেব তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "যুগলক্ষণ মূর্ত্ত করিয়া যুগপ্রবর্ত্তকদিগের আবির্ভাব হয়। যুগসন্ধি-কালে অন্তর্নিহিত শক্তি-মন্থনে বিশেষ বিশেষ যুগকর্ম্মী ব্রত ও সঙ্কল্প লইয়া জাতীয় জীবনে দেখা দেন।" ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এই সকল জীবন জাতীয় জীবনের শুধু সম্পদ্ নহে, নিয়ন্ত্রা।

ঠিক এইরূপ এক ঐতিহাসিক যুগক্ষণে আমাদের কর্ম্মবীর আলামোহনের জন্ম হয়। তিনি বঙ্গমাতার যুগ-সন্তান। কালের অপরিহার্য্য গতি ও নিয়তি নিজ জীবনধারার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সকল দারিদ্র্যের চরম পরীক্ষার মধ্য দিয়া আলামোহন আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের বলে অকুতোভয়ে জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছেন।

কর্ম্মবীর আলামোহনের জীবনতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য এইখানে। দারিদ্র্য, বিপদ্, অনশন, উপেক্ষা—কোন অবস্থাই তাঁহার অন্তর্নিহিত সংজ্ঞা ও শক্তিকে ম্লান কিংবা ম্রিয়মান্ করিতে পারে না। তাঁহার জীবনের ধারা ভরসা ও সাহসে ওতঃপ্রোত। মানুষের জন্ম জয়লাভের জন্য, হার মানিবার জন্য নহে—এই তাঁহার বিশ্বাস ও সঙ্কল্প। সেইজন্য তাঁহার জীবন অসম্ভব করিতে, অঘটন-ঘটন-পটিয়সীরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে এবং উদ্বেগহীন হইয়া অগ্রসর হইতেছে। কোনও কাজ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না। জীবনের কোন সত্য স্বপ্ন বা পরিকল্পনা অবাস্তব থাকিবে—ইহা তিনি মানেন না। সেইজন্য দুর্জ্জয় তাঁহার শক্তি, অফুরন্ত তাঁহার উল্লাস এবং আকাশদপ্ত

তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। এইখানে "কর্ম্মবীর" কথার সার্থকতা ও চরিতার্থতা।

বাঙালী বড় হইবে, বাঙালী আর ছোট থাকিবে না—এই তাঁহার মনের সাধ, প্রাণের স্বপ্ন। সেই মুড়ি-বেচা উপবাসী সঙ্গতিহীন যুবক এই বিশ্বাস-বিজলীর রঞ্জনে জীবনকে ভরপূর করিয়া প্রতিষ্ঠানের পর প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান গড়িয়া চলিয়াছেন। অন্য বাঙালী ব্যবসাদার কিম্বা শিল্প-প্রতিষ্ঠাতাদিগের সহিত কর্ম্মবীর আলামোহনের বিশেষ পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য এই, আলামোহনের অকুতোভয়তা, দুর্জ্জয় সাহস এবং নির্ভয় পদবিক্ষেপ, নিখুত আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞানে ডগমগ হইয়া ক্ষেত্রবিশেষে আত্মসম্মানরক্ষার্থে যেমন ক্রোধ প্রকাশে সক্ষম, আবার তেমনি আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানে ক্ষেত্রবিশেষে অবিনয়ী হইতে একেবারে অক্ষম। জুট য়্যাসোসিয়েশানের পাকা সাহেবদের আখড়ায় বসিয়া বাঙালী ব্যবসাদারদের ইজ্জত রক্ষা করিতে কত ইউরোপীয় ভ্রুকুটির মধ্যে নির্ভয়ে পুনঃ পুনঃ কাজ করিয়াছেন তাহার গণনা করা যায় না। কোন সাহেবের কোন ভ্রুকুটি তাঁহার মধ্য হইতে জাতীয় ব্যবসার প্রগতি এবং উন্নতির পথে বাধা আনিতে পারে নাই।

কামাল পাশা একস্থানে বলিয়াছেন—"My genius had the strength to find genius in others" কর্ম্মবীর আলামোহনের জীবনে এই উক্তি নানা প্রকারে সার্থক হইয়াছে। পাকা জহুরী হইয়া অন্যের ভিতর মূল্যবান্ গুণ অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে চিনিয়া লইয়া শুধু যে সুযোগ দিয়াছেন তাহা নহে, সেই সকল কর্ম্মীদের সংগঠন করিয়াছেন এবং কর্ত্তৃত্ব ও নেতৃত্ব বহন করিতে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি কতবার সহাস্য-বদনে বলিয়াছেন—"আমার কাজ তোমায় সুযোগ দেওয়া, তোমার

ভিতরে যদি মসলা থাকে, তুমি ফুটে উঠ্‌বে ও আমার কাজের পক্ষে উপযুক্ত হবে।" এই যে যুবকদের সুযোগ দেওয়ার ধর্ম্ম, ইহা প্রকৃত বীরের ধর্ম্ম। কোন বীর প্রতিযোগিতা ভয় করে না, ভয় পায় কর্ম্ম-হীনতা, আলস্য, কর্ম্ম-উপেক্ষা, উদাসীনতা এবং ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি। কর্ম্মবীর আলামোহন সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণা করেন বাঙালী যুবকের এই ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তিকে। চালাকি দ্বারা বা ফাঁকির সাহায্যে কোন কাজ কোন দিন হয় না। খাঁটীভাবে পরিশ্রম করিব—বুকের পাটা ও বাহুবল ভরসা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িব—জয়ী হইবার জন্য ইহা কর্ম্মবীর আলামোহনের জীবনে অগ্নিমন্ত্র; বজ্রসঙ্কল্প—আমি জীবনে জয়ী হইব।

পরাধীনতার গ্লানি জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে যে বিষময় ক্লীবত্ব সংক্রামিত করিয়াছে তাহা দেখিয়া আলামোহন হৃদয়ে অসহ্য বেদনা অনুভব করেন এবং ক্লীবত্ব-অভিশাপ হইতে বাঙালী জাতিকে উদ্ধার করিতে তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যোগ আরও বর্দ্ধিত ও প্রসারিত করিয়া প্রতিনিয়ত কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার করিতেছেন। ক্লীবকে কর্ম্মঠ করিব, অলসকে শ্রমশীল করিব, উদাসীনকে ব্রতনিষ্ঠ করিব—এই তাঁহার জীবনের সাধনা এবং সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাঙালী যুবক স্রষ্টা হইবে, বাঙালী যুবকের সৃষ্টি-কৃতিত্ব সাত-সমুদ্র তের নদী অতিক্রম করিয়া দিগ্বিজয়ী হইবে—এই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা —এই তাঁহার লক্ষ্য। বিগত একশত বৎসরের বাঙালী শিল্প-প্রবর্ত্তক-গণের মধ্যে এইরূপ জাতীয় আকাঙ্ক্ষানিষ্ঠ, নির্ভীক, ঝড় তুফানে দৃক্‌পাতহীন, মণ্ডলীগত ও দেশগত সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনতৎপর বীর আর কে আছেন? কর্ম্মবীর আলামোহনের নিকট তাঁহার এই হৃদয়বিভূতির জন্য বর্ত্তমান বাঙালী যুবকসমাজ এবং ভবিষ্যতের বাঙালীজাতি চিরকাল ঋণী থাকিবে।

ইতিহাস-দার্শনিকেরা বিশ্বাস করেন' যে, যুগপ্রবর্ত্তকগণ কালের এক অদ্ভুত তালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থান ও কালের ছন্দ অনুসারে এই সকল বিশেষ বিশেষ মহাশক্তিমানদের জন্ম হয়। যে কোন ঐতিহাসিক একথা অনিবার্য্যভাবে স্বীকার করিবেন যে, কর্ম্মবীর আলামোহনের জন্ম ১৮৫৭ বা ১৮৮৭ সালে হইতে পারিত না। তাঁহার জীবনের মূলে যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, শিল্প-ও বাণিজ্য-পরিকল্পনা এবং জাতীয়তাবাদের ঋকৃশক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে ইহা ১৮৫৭ সালের আব্‌হাওয়ায় সৃষ্ট হয় নাই। ১৮৫৭ সালের উগ্রতেজ জাতিসত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যে আলোড়নের সৃষ্টি করিতে থাকে তাহারই ক্রম-প্রকাশমান উদ্দামরূপ আমরা কংগ্রেস আন্দোলনের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। এই আব্‌হাওয়ার নর্ম্মকথা হৃদয়ে বহন করিয়া কর্ম্মবীরের জন্ম হইল। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ এই কথা বলিবেন যে, উদাত্তপ্রাণ আলামোহন বাংলার ষড় ঋতু এবং নদী-মাতৃকা ভূমি ব্যতিরেকে এইরূপ প্রগল্‌ভ মেধা ও অক্লান্ত কর্ম্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারিতেন না। বাংলার আকাশ এবং বাংলার বাতাস এই দুইয়ের অনুকূল অভিসিঞ্চনের মধ্যে আলামোহনের আত্মা শক্তি-উৎস এবং প্রেরণাকেন্দ্র। তাঁহার বীরত্বের মূলে তাই এত মৌলিকতা ও দুঃসাহস। তিনি পাকা মাঝির ন্যায় সকল তুফানের মধ্যে নির্ভীক হইয়া অগ্রসর হইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। জাতির বিরাট ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, অফুরন্ত আত্ম-বিশ্বাস এবং জাতীয় জীবনকে সংগঠন করিবার দৃঢ়সঙ্কল্পে তাঁহার জীবনের শক্তির উৎস এবং প্রেরণা। নিভৃতে সকল সান্নিধ্যের মধ্যে যে কেহ তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়াছেন তিনি তাঁহার হৃদয়ে প্রদীপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ সহজেই অনুভব করিয়াছেন। বাক্যালাপ করিতে করিতে সঠিক উপভোগ করা যায়—তাঁহার

অন্তর্দৃষ্টি এবং ভবিষ্যতের সংজ্ঞা দেশ এবং জাতিকে কত বিরাট ও মজবুতরূপে দর্শন করিতেছে।

বীরের ধর্ম্ম গৌরবময় ভবিষ্যতে বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসই কর্ম্মবীর আলামোহনের সকল শক্তি ও কর্ম্মপ্রেরণা এবং সকল ঐন্দ্রজালিক কর্ম্মকুশলতার অফুরন্ত উৎস। এই অধঃপতিত নির্জীব ভরসাহীন আত্মবিশ্বাসহারা বাঙালী জাতির মধ্যে দুর্দ্দমনীয় শক্তিপুঞ্জ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মবীর আলামোহন বাঙালী জাতির মধ্যে অভিনব ভরসা জাগ্রত করিয়াছেন এবং নিজেকেও বাংলার সন্তান-রূপে ভারতের কাছে আর দুনিয়ার কাছে পরিচয় দিয়া নিজেও ধন্য হইতেছেন। জানি না কবে এই কর্ম্মবীরের বীরত্বপূর্ণ আশীর্ব্বাদ বাঙালী গ্রহণ করিবে এবং সারা পৃথিবীময় তাহার নেতৃত্বে নব নব কীর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর সকল অংশে বাঙালীর গৌরবধ্বজা উড্ডীয়মান করিবে এবং কর্ম্মবীর আলামোহনের ব্যাকুল স্বপ্নকে সার্থক ও চরিতার্থ করিবে।

কর্ম্মবীর আলামোহন-সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

সুবিরাট হর্ম্ম্যকক্ষে সুপ্তিমগ্ন রাজেন্দ্র-নন্দিনী,—
কাহিনীর কল্পকন্যা জড়ত্বের পিঞ্জরে বন্দিনী !
নাহি কোনও শব্দ-সাড়া, চেতনার চিত্তস্পন্দহীন,
খনিগর্ভে মণিসম ! বর্ষে বর্ষে কত রাত্রিদিন
কেটে চলে সেই মত !

অকস্মাৎ রাজার নন্দন—
পৃষ্ঠে তূণ, হস্তে ধনু, দীপ্ত ভালে বালার্ক-চন্দন,
এল আজি কোথা হ'তে প্রাণবন্ত পক্ষীরাজে চড়ি',
স্বর্ণ-কাঠী স্পর্শে তার মুহূর্ত্তের মন্ত্রে যেন হরি'
নিল সর্ব্ব বিঘ্ন-বাধা ! রাজকন্যা লভি' সে পরশ
উঠি' বসে শয্যা 'পরে, মুখে হাসি, হৃদয়ে হরষ ।
সেই সঞ্জীবনী স্পর্শে—লক্ষ্মী যেন ছাড়ি' সিন্ধুতল !
কক্ষে কক্ষে খুলে দ্বার, দ্বারে দ্বারে সাজে সান্ত্রীদল,
মন্দিরে আরব্ধ পূজা, তাম্রকণ্ঠে উঠে ঘণ্টারব,
প্রজাদল চলে পথে, পুরীভরা আনন্দ উৎসব !
প্রাসাদ তোরণমঞ্চে নহবৎ গাহে আগমনী,
দিকে দিকে জয়ধ্বনি—শতকণ্ঠে জাগে জাগরণী !
পুষ্পে, মাল্যে, আভরণে আলোয় আলোয় দিক্ আলা,
মোহন মধুর হাস্যে রাজ-লক্ষ্মী দিলা বরমালা
বিজয়ী বীরের কণ্ঠে ; পুরনারী দেয় হুলাহুলি,
কেহ বা বাজায় শঙ্খ পথপ্রান্তে বাতায়ন খুলি' !

উদ্যোগী পৌরুষ-ভাগ্যে লক্ষ্মীলাভ—চিরাগত কথা,
বঙ্গের অঙ্গণতলে পুনঃ সত্য আজি সে বারতা ।
জাগায়ে চারণকণ্ঠ জাগ কবি, জাগ জনগণ,
ফুকারি' প্রাণের শঙ্খ ধন্য কর এ অভিনন্দন ।

আমাদের দেশের কুটির-শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি আধুনিক তথ্য

ভারতের কুটির-শিল্পকে যাঁহারা কৃপা বা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন তাঁহারা ভারতীয় কুটির-শিল্পের প্রকৃত ইতিহাসের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। ভারতের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ইয়োরোপীয় বণিকগণ যখন এদেশে আসেন তখন কুটির-শিল্পই ছিল ভারতীয় শিল্পের মেরুদণ্ড। ভারতীয় কুটির-শিল্পীরা সমগ্র ভারতের সর্ব্বপ্রকার অভাব ত মিটাইতই, উপরন্তু ইয়োরোপ ও এশিয়ার নানা স্থানে তাহাদের বিশ্ববিশ্রুত মসলিন, রেশম প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানী করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিত। সে যুগের ভারতীয় শিল্প যে অনেক বিষয়েই সম-সাময়িক ইয়োরোপীয় শিল্প অপেক্ষা বহু গুণে উৎকৃষ্ট ছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে যখন প্রথম বাণিজ্য আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা এদেশ হইতে বিলাতে কাঁচা মাল চালান দিতেন না, এদেশের কুটির-শিল্পজাত মনোরম দ্রব্যসম্ভার বিলাতে রপ্তানী করাই ছিল তাঁহাদের প্রধান ব্যবসায়। টমাস্ মন্‌রো প্রমুখ উদারচেতা ও নিরপেক্ষ ইংরাজকে যখন সে যুগের ভারতে বিলাতী শিল্পদ্রব্যের প্রসার-সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়, তখন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ভারতে ইয়োরোপীয় শিল্পদ্রব্যের বাণিজ্য বিস্তারের পথে মূল বাধা দুইটি। প্রথমতঃ, ভারতীয় কুটির-শিল্পীরাই ভারতের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম এবং দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ইয়োরোপীয় শিল্পদ্রব্য

অপেক্ষা বহু বিষয়ে উৎকৃষ্ট ছাড়া কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে।

পলাশীক্ষেত্রে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর হইতেই ভারতীয় কুটির-শিল্পের অধঃপতন সুরু হয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও দেশের শিল্পসমৃদ্ধির মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান, ভারতের কুটির-শিল্পের অবনতির ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহা অতি সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়। ভারতে ইউরোপীয় শিল্পদ্রব্য প্রচলিত করিবার জন্য সে কালে যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা সে যুগের বহু চরিত্রবান ও নিরপেক্ষ ইয়োরোপীয়ের নিকটেও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই। ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের উপর অতি উচ্চহারে শুল্ক ধার্য্যকরণ, ভারতে নামমাত্র অথবা বিনা শুল্কে বিদেশী দ্রব্য আমদানী করিয়া রেলওয়ের সাহায্যে দেশের সর্ব্বত্র তাহা ছড়াইয়া দেওয়া, দেশীয় শিল্পীদের উপর অবিচার প্রভৃতি নানা কারণে ভারতীয় কুটির-শিল্পের ধ্বংস সাধন হয়। ইংরাজ ঐতিহাসিক উইল্‌সন্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অসহায়তার সুবিধা গ্রহণ না করিলে তৎকালীন ইয়োরোপীয় বণিকগণ কখনই ভারতীয় শিল্পীদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইতে পারিত না। অনেকে মনে করেন, উন্নততর ইয়োরোপীয় যন্ত্রশিল্পের সহিত অসমান সংঘর্ষের ফলেই অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দেশীয় কুটির-শিল্পের বিনাশ হইয়াছে, ইহার সহিত ভারতের স্বাধীনতা বা পরাধীনতার সম্পর্ক সামান্যই। এই ধারণাটি বোধ হয় সম্পূর্ণ সত্য নহে। ভারতের এই সুবিশাল পণ্যক্ষেত্র করায়ত্ত না থাকিলে এবং ভারতে ইয়োরোপীয় মাল আমদানীর উপর উপযুক্ত রক্ষণ-শুল্ক ধার্য্য করা সে যুগে সম্ভবপর থাকিলে ইয়োরোপীয় যন্ত্রশিল্প সে-কালে এত দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিত কিনা তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সমগ্র ইয়োরোপ সে সময়ে যুদ্ধবিক্ষুব্ধ। ইয়োরোপ

তখন শিল্পপ্রসারের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল না বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না। ভারতবর্ষের ন্যায় অবাধ বাণিজ্যের দেশ বর্ত্তমান না থাকিলে এবং ভারতের উন্মুক্ত ধনভাণ্ডার সহায়তা না করিলে সে যুগে নবোদ্ভাবিত ষ্টীম ইঞ্জিন, পাওয়ার লুম, স্পিনিং জেনি প্রভৃতি যন্ত্রগুলি পরীক্ষাগারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাণিজ্য-জগতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। এ সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও আধুনিক যন্ত্রশিল্পের পক্ষেও যে সর্ব্বক্ষেত্রেই কুটির-শিল্পের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়া সম্ভব নহে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ জাপান, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের কুটির-শিল্প হইতে পাওয়া যায়। এরূপ বহু নিত্য-ব্যবহার্য্য পণ্য আছে যাহা বৃহদায়তন ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত করিলে লোকসান হয়। এই জাতীয় দ্রব্যগুলি একমাত্র কুটির-শিল্পীদের দ্বারাই প্রস্তুত হওয়া সম্ভব। বিদ্যুৎ ও ছোট ছোট মেশিনের ব্যবহার এবং কাঁচা মাল কেনা ও তৈয়ারী মাল বেচা প্রভৃতি ব্যাপারে আধুনিক সমবায় নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিলে কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যও যে বৃহৎ ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত দ্রব্যের ন্যায় অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে তাহা বর্ত্তমান নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। সস্তা মাল সরবরাহ করিতে জাপান যে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু ভারতে যত জাপানী মাল আমদানী হয় তাহার ৬০%ই যে জাপানী কুটির-শিল্পজাত একথা বোধ করি অনেকেই জানেন না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান যন্ত্র-সভ্যতার যুগেও কুটির-শিল্প মোটেই "সেকেলে" হইয়া যায় নাই, জাতির অর্থ-নৈতিক করিকল্পনায় এযুগেও উহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ইয়োরোপীয় বণিকগণের সহিত অসমান স্বার্থ-সংঘাতের ফলে ভারতীয় কুটির-শিল্প বিনষ্টপ্রায় হইলে বহু কুটির-শিল্পী উপায়ান্তর না

পাইয়া কৃষক ও কৃষি-মজুরের সংখ্যা অযথা বৃদ্ধি করিল। দেশের আবাদী জমিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িল যে, কৃষিকার্য্যে লাভ হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল, শিল্প ত গেলই, তাহার সঙ্গে কৃষিও যাইতে বসিল। ইহার উপর ভারতবাসীরা নিজেরাও এক মহাভুল করিয়া বসিল। কুটির-শিল্পের মূলগত বৈশিষ্ট্য ও বৃহদায়তন শিল্পের সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার কোন চেষ্টা না করিয়াই অন্ধের ন্যায় ইউরোপ ও আমেরিকার অনুকরণে তাহারাও দেশে যোগ্যাযোগ্য ক্ষেত্র বিচার না করিয়া বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। ফলে, দেশের যে সকল চাহিদা তখনও দেশের কুটির-শিল্পীরাই পূরণ করিতেছিল তাহা মিটাইবার জন্যও মিল স্থাপিত হইল এবং সহস্র সহস্র কুটির-শিল্পী বেকার হইয়া পড়িল। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের যুগেও ইংলণ্ডের কুটির-শিল্পীদের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল, কিন্তু সে দেশে সে যুগে এত দ্রুত নানা প্রকার বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার হইয়াছিল যে, ব্যবসায়চ্যুত কুটির-শিল্পীদিগকে বেশী দিন বেকার হইয়া থাকিতে হয় নাই, তাহারা সকলেই বিভিন্ন প্রকার বৃহদায়তন কারখানার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশে না হইল এদিক, না হইল ওদিক। ইয়োরোপীয় অনুকরণে দেশে মিল স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বা বৈচিত্র্য এরূপ হইল না যাহাতে বেকার কুটির-শিল্পীদের পুনরায় অন্নসংস্থান হইতে পারে। এই বিবেকবিচারহীন নীতির অনুসরণের ফলে একমাত্র আমাদের বাংলা দেশেই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে কতজন কুটির-শিল্পী তাহাদের রোজগারের পন্থা হারাইয়াছে, কলিকাতা কর্পোরেশন কার্শিয়াল মিউজিয়াম কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পরপৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট তালিকা হইতে তাহা সহজেই অনুমিত হইবে।

শিল্পের নাম	বৎসর	শিল্পীর সংখ্যা	কর্ম্মচ্যুতের সংখ্যা	বাৎসরিক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ
(১) রেশম	১৯০১	৫০,৩৯৩		
	১৯৩১	৫,৬৪২	৪৪,৭৫১	১,০৪,৭১,৭৩৪৲
(২) তাঁত	১৯০১	৩,৬২,৭৪০		
	১৯৩১	১,৭১,৬৯২	১,৯১,০৪৮	৩,০৫,৬৭,৬৮০৲
(৩) কাঁসাপিতল	১৯০১	৪৮,২৬১		
	১৯৩১	৭,২৫৭	৪১,০০৪	৭৩,৮০,৭২০৲
(৪) জুতা প্রস্তুত	১৯১১	৪৪,৭৩৫		
	১৯৩১	২৪,৪৯১	২০,২৪৪	৩৬,৪৩,১২০৲
(৫) কর্ম্মকার	১৯১১	৬৮,৪১৬		
	১৯৩১	৪২.৬১৩	২৫,৮০৩	৪৪,৩৯,৭২২৲
(৬) ধানভানা	১৯০১	২,১০,০০০		
	১৯৩১	১,৪৭,০২৪	৬২,৯৭৬	৩০,২২,৮৪৮৲

উপরে বর্ণিত ও অন্যান্য নানা কারণে দেশে বর্ত্তমান যে দারুণ বেকার সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা সমাধান করিবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায়—দেশে নূতন ছাঁচে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কুটির-শিল্পকে পুনরায় গড়িয়া তোলা। শিল্পজগতে ভারতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দেশে বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু যে দেশে জন প্রতি বাৎসরিক আয় গড়ে ৫০৲ সেখানে এই জাতীয় শিল্প-প্রসারের ভার মুষ্টিমেয় ধনিক ও দেশের গভর্ণমেণ্টের উপর, জন-সাধারণের উপর নহে। উপরন্তু বৃহদায়তন শিল্প হইতে দেশের মোট সমৃদ্ধি বাড়ে সত্য, কিন্তু এই সমৃদ্ধি দেশবাসীর মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয় না, ইহাতে অল্প কয়েকজন ধনিকেরই ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়া থাকে। দেশে উপযুক্ত কুটীর-শিল্পের প্রসার করিতে পারিলে বহুসংখ্যক ব্যক্তি লাভবান হইতে পারে। কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, দেশের আবাদযোগ্য জমিগুলিকে খুব ভালভাবেই চাষ করিতে হইলে যত

চাষী ও মজুরের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অত্যধিকসংখ্যক লোক এই কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। সুতরাং এইদিক দিয়া বেকার-সমস্যা সমাধানের বিশেষ কোন সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, দেশব্যাপী এই গুরুতর অন্নসমস্যা সমাধান করিতে হইলে, দেশময় কুটীর-শিল্প ছড়াইয়া দেওয়া হইল সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত পন্থা।

দেশে কুটীর-শিল্পের উপযুক্ত বিস্তার করিতে হইলে সমীচীন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে বর্ত্তমান যে শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহার 'literary bias' বড় অধিক। শিল্পের প্রতি জনসাধারণের আস্থা জন্মাইতে হইলে দেশময় একটি শিল্পমনোভাবের সৃষ্টি করা দরকার। বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীতে উহা হওয়া অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্ত্তিত শিক্ষায় অধিকতর industrial ও commercial bias আনিতে হইবে। দেশময় উপযুক্ত সংখ্যায় উৎকৃষ্ট শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান দেশে যে অল্প কয়েকটি এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে তাহা দ্বারা দেশের প্রয়োজনের অতি নগণ্য অংশই পূর্ণ হওয়া সম্ভব। দেশে উপযুক্ত শিল্প-শিক্ষা-প্রচারের দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের। গভর্ণমেণ্টের সে দায়িত্বজ্ঞান না থাকিলে আন্দোলন করিয়া সে জ্ঞানের উদ্রেক করাইতে হইবে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। এই শিল্প-বিদ্যালয়গুলি দ্বারা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উপকার হইলেও এগুলি দেশের অসংখ্য নিরক্ষর শিল্পীর বিশেষ কাজে আসিবে না। তাহাদিগের শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টকে ভ্রাম্যমান শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহারা বক্তৃতা, ফিল্ম, হাতে কলমে পরীক্ষা দেখান প্রভৃতি দ্বারা নিরক্ষর শিল্পীদিগকে আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন।

এ যুগে প্রকৃতই উন্নতি করিতে হইলে দেশীয় কুটির-শিল্পীকে মামুলি পন্থা অনেকাংশেই পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক সাজসরঞ্জাম

ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারে অভ্যস্ত হইতে হইবে। জাপানের কুটির-শিল্পের উন্নতির মূলে তাহার কুটির-শিল্পীর বৈদ্যুতিক শক্তি ও ছোট ছোট যন্ত্রের ব্যবহার। যন্ত্রসাহায্যে কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যও standardise করা সম্ভব, সুতরাং পূর্ব্বে একজাতীয় দ্রব্য বহু পরিমাণে পাইবার যে অসুবিধা ছিল তাহা এখন দূর করা যাইতে পারে। বোম্বাই অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমাদের বাংলাদেশে এ বিষয়ে নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট এ দিকে কোন দৃষ্টিই দিতেছেন না, ইহার উপযুক্ত প্রতীকার করিতে হইবে। জাপানী ও জার্ম্মাণ যন্ত্রের অনুকরণে আমাদের দেশের উপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে। লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পে আমাদের দিন দিনই যে প্রকার দ্রুত উন্নতি হইতেছে তাহাতে এই শিল্প গড়িয়া তোলা কোন ক্রমেই অসম্ভব হইবে না। নিরক্ষর শিল্পীদিগের ভিতর যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত করিতে হইলে পূর্ব্ববর্ণিত ভ্রাম্যমান শিক্ষক-দিগের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে।

আধুনিক যুগের প্রতিযোগিতার বাজারে সস্তায় মাল সরবরাহ করিতে না পারিলে কোন শিল্পই টিকিতে পারে না। কুটির-শিল্পীদিগকে খুচরা দরে কাঁচামাল কিনিতে হয়, কাজেই তাহাদের প্রস্তুত-ব্যয় অধিক পড়িয়া যায়। দেশের কুটির-শিল্পীদের লইয়া সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারিলে এই অসুবিধা দূর হয়, কারণ তাহা হইলে শিল্পীগণ পাইকারী দরে কাঁচামাল পাইতে পারে। এই সমবায় নীতি অনুসরণের ফলে জাপান, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের কুটির-শিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রে বৃহদায়তন কারখানার সহিত সমান প্রতিযোগিতা পর্য্যন্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের দেশে এই আন্দোলন এখনও আশানুরূপ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

ইহার কারণ, দেশে উপযুক্ত শিক্ষা ও মনোভাবের অভাব, গভর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি ও তাঁহাদিগের দ্বারা নিযুক্ত কর্মচারিগণের অযোগ্যতা। অতীতের জন্য অনুশোচনা না করিয়া বর্ত্তমান যাহাতে এই সমবায় সমিতিগুলি উপযুক্ত মত গড়িয়া তোলা যায় সে দিকে আমাদের শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে।

কুটির-শিল্পীদিগের পক্ষে মাল প্রস্তুত করিবার পর উপযুক্ত লাভে তাহা কাট্‌তি করা কঠিন ব্যাপার। সারা দেশে অসংখ্য কুটির-শিল্পী ছড়াইয়া রহিয়াছে, কে তাহাদের মাল একত্র সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি লাভের বাজারে চালান দেয়? এ ক্ষেত্রেও সমবায়-নীতিই আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রশস্ত উপায় হইবে। কাঁচামাল ক্রয় ও তৈয়ারী মাল বিক্রয় প্রভৃতি ব্যাপারে সমবায় পন্থা অবলম্বন করিতে পারিলে গ্রাম্য মহাজনের কবল হইতে শিল্পীরা রেহাই পাইবে এবং দেনার দায়ে মহাজনের ইচ্ছামত নামমাত্র দরে মাল বেচিতে বাধ্য হইবে না। কুটির-শিল্পজাত দ্রব্য সম্বন্ধে জনসাধারণের বহু ভ্রান্ত ধারণা আছে, ফলে, দেশে এই সকল মাল চালু করিতে বেগ পাইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ তাঁতের কাপড়ের কথা ধরা যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ধারণা, মিলের কাপড়ের তুলনায় তাঁতের কাপড়ের দাম অনেক বেশী। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মিলের কাপড় অপেক্ষা তাঁতের কাপড় যে বহুগুণ টেকসই সেকথা আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাই। মিলের কাপড় অপেক্ষা তাঁতের কাপড় দামে যে দুই চারি আনা বেশী তাহা তাঁতের কাপড়ের স্থায়িত্ব ও অন্যান্য গুণে সম্পূর্ণই পোষাইয়া যায়। জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে হইলে এবং কুটির-শিল্পজাত দ্রব্য যে কত সুন্দর ও মজবুত হইতে পারে তাহা জনসাধারণের গোচর করিতে হইলে কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরগুলিতে

নিয়মিতভাবে কুটির-শিল্পের প্রদর্শনী খুলিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট ও কমার্শিয়াল মিউজিয়াম প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। প্রদর্শনীর জন্য মাল আনা ও ফেরৎ পাঠানর ভাড়া সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ কন্‌সেশনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং প্রদর্শনীর ষ্টলে যাহাতে মাল বিক্রয় করিবারও স্থবিধা থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পূজা, বড়দিন প্রভৃতি মরশুমের সময় এই প্রদর্শনীগুলি খুলিলে কুটির-শিল্পজাত দ্রব্য অতি সহজেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে এবং এই সময়ে শিল্পীরা যে পরিমাণ মাল বিক্রয় করিতে সক্ষম হইবে তাহাতে তাহাদের ৩।৪ মাসের অন্নসংস্থান হইয়া যাইবে।

পরিশেষে আমরা কুটির-শিল্প ও আধুনিক বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের মধ্যে মূলগত পার্থক্য কি এবং শিল্পজগতে কুটির-শিল্পের বৈশিষ্ট্য কিসে তাহা আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। অনেকে প্রশ্ন করেন যে, আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সহিত দরে প্রতিযোগিতা করিতে না পারিলে দেশে নূতন করিয়া কুটির-শিল্প গড়িয়া তুলিয়া লাভ কি? ভবিষ্যতে দেশে বৃহদায়তন শিল্পের উপযুক্ত প্রসার হইলে কুটির-শিল্প টিকিবে কি করিয়া? কথাটি খুবই সত্য। কুটির-শিল্পের পক্ষে বৃহৎ কারখানার সহিত দরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব না হইলেও অতি কঠিন। কাজেই আমরা মোটেই এই অসমান প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইব না। যে সকল পণ্য কারখানায় বহু পরিমাণে প্রস্তুত করিলে তাহার সবটা কখনই কাট্‌তি হওয়া সম্ভব নয়, কাজেই কারবারেও লোকসান হয়, কুটির-শিল্পীদের দ্বারা আমরা মূলতঃ সেই সকল দ্রব্যই প্রস্তুত করাইব, তাহা হইলে কুটির-শিল্প ও কারখানার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন প্রশ্নই উঠিবে না। উদাহরণ স্বরূপ নিত্য নূতন নক্সার কাপড়, হোসিয়ারি দ্রব্য প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে

পারে। একই নক্সার অসংখ্য সাড়ী বা গেঞ্জী মোজা কলে প্রস্তুত করিলে তাহার সবটা কখনই কাটৃতি হয় না, কারণ এই সব বিষয়ে লোকের রুচি অল্পদিনের ভিতরেই বদ্‌লাইয়া যায়, আবার এদিকে অল্প পরিমাণে তৈয়ারী করিলেও মিলের খরচা পোষায় না। কাজেই এই সব ক্ষেত্রে কুটির-শিল্পীর সম্পূর্ণ একাধিপত্য। চাহিদা অনুযায়ী কম বেশী মাল প্রস্তুত করিয়া শিল্পী বাজারে সরবরাহ করিতে পারে। আরও এক কথা, ইচ্ছামাত্রই কলে নক্সা পরিবর্ত্তন করা যায় না। মিলের পক্ষে ইহা বহু ব্যয়সাধ্য, কিন্তু কুটির-শিল্পীর পক্ষে ইহা অতি সহজ। কাজেই যে ক্ষেত্রে লোকের রুচি অল্পকালের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত হয় সেই ক্ষেত্রে মিলের সহিত কুটির-শিল্পের প্রতিযোগিতার কোনই সম্ভাবনা নাই, কুটির-শিল্পীর সে স্থলে অবাধ রাজত্ব। এই জাতীয় বিশেষ শ্রেণীর পণ্য প্রস্তুত করা ছাড়া বৃহৎ কারখানায় যে সকল মাল তৈয়ারী হয় তাহারও অনেকগুলি, বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, কুটির-শিল্পীদের দ্বারা আংশিকভাবে প্রস্তুত করান সম্ভব। জাপানের বাইসাইকেল শিল্প এই জাতীয় পণ্যের নিদর্শন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র সাহায্যে জাপানী কুটির-শিল্পীরা বাইসাইকেলের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত করিবার ভার লয়। বিভিন্ন কুটির-শিল্পী কর্ত্তৃক যন্ত্রে প্রস্তুত একই জাতীয় দ্রব্যগুলি মাপে ও অন্যান্য গুণে অভিন্ন হইয়া থাকে। ফলে একটি কেন্দ্রীয় কারখানায় নানা কুটির-শিল্পী দ্বারা প্রস্তুত অংশ জোড়া দিয়া সম্পূর্ণ বাইসাইকেল প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে এই জাতীয় মিশ্র কারখানার প্রসার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে দেশে কুটির-শিল্প গড়িয়া তুলিলে যন্ত্র-শিল্পের সহিত উহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত থাকিবেই না, বরং কুটির-শিল্প ও যন্ত্রশিল্প উভয়ে উভয়ের পরিপূরক হইয়া দেশের সকল চাহিদা সকল অভাব দূর করিতে সক্ষম হইবে।

আলামোহন দাশ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কর্ম্মী তুমি, বীরও তুমি—সত্য স্বাবলম্বী নিজে,
ধন্য হলো যুক্ত হয়ে “কর্ম্মবীর” এই উপাধি যে।
স্বাধীন, সবল, শক্ত, শাক্ত, আত্মশক্তির প্রতীক্ তুমি,
কড়া-মিঠা খাঁটি মানুষ করলে উজল বঙ্গভূমি।

লৌহকে যে স্বর্ণ করে পরশ-পাথর তারেই বলে,
জংলা জলা করলে সোণা তোমার পরশ এই ভূতলে।
নীরস তুমি, কাষ্ঠ তুমি, চন্দন কাঠ, কিম্বা শমী,
কোনো দেশের কোনো যুগের কর্ম্মী চেয়ে নও হে কমই

পাষাণ বুকে মধুর স্বপন লোহার চোখে প্রেমের ছবি,
ভক্তি এবং শক্তি তোমার করে যা তা অসম্ভবই।
বক্ষে যাহার সুর-সরিৎ সাধ্য কে তায় রুদ্ধ রাখে,
অমিত তেজ ভাঙ্গে ভাসায় দারিদ্র্য ও উপেক্ষাকে।
কোথায় সরে দুঃখ দারুণ, পুঞ্জীভূত বিঘ্নবাধা,
হে বীর তোমার জয়রথেরি পন্থা যে শিব সরল সাদা।
কি দুর্নিবার! ছুটছো তুমি পেতে তোমার আদর্শকে
জয়ও তোমার যশও তোমার ধন্য তুমি এই ভূলোকে।

তোমার সাথে নাইকো চেনা—কিন্তু তোমার কর্ম্ম চিনি,
তুমিই ভাবুক ভাগ্য লয়ে খেলছো নিতুই ঝিনিমিনি।
উদ্যোগী যে পুরুষ তুমি—লক্ষ্মী তোমায় বেড়ান খুঁজি'
বুকই তোমার স্বর্ণখনি—বিশ্বাসই যে বিরাট পুঁজি।
বাঙালী আর বাঙ্‌লাকে চাও করতে বড় করতে ধনী
তুমি সকল জাতির জ্ঞাতি—বাঙলা দেশের মাথার মণি,
অভয়া দিন অভয় নিতি দীর্ঘ জীবন সুদীর্ঘ হোক্
লৌহ পাষাণ সঙ্গী তোমার—বক্ষে তোমার অমৃতলোক।

বয়ন-শিল্প ও শিক্ষা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস, এম. টি. এম., এ. টি. আই.

মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে খাদ্যের পরই বস্ত্রের গুরুত্ব অধিক। সুসংবদ্ধ সভ্য-সমাজ দীর্ঘকাল বস্ত্র-সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে না। প্রতীচীর অনেক স্থানে এই সমস্যার সমাধানের জন্য নানা প্রকার আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে এবং বিজ্ঞান-সম্মত সুচিন্তিত পরিকল্পনার উপর বস্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের দিক্ হইতে বিশেষ কোন উদ্যোগ-আয়োজন দেখা যাইতেছে না, কোনরূপ সুচিন্তিত পরিকল্পনার উপর এই শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ ও চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে না। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প ক্রমশঃ বর্ত্তমান যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নৈরাশ্যের কারণ নাই সত্য; কিন্তু এই শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা না হইলে ইহা একদিন বিশ্ব-প্রতিযোগিতার চাপে অবসাদ-গ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িতে পারে। বর্ত্তমান মহাসমরের অবসানে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প কোথায় দাঁড়াইবে, তাহা বলা কঠিন; কেন না, এই মহাসমরের ফলাফলের উপর অনেক বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়ও নির্ভর করিতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই আমাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আমাদের পক্ষে এখন হইতেই এমন একটি নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাহাতে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা সৃষ্ট হইতে পারে।

এদেশে বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইলে প্রথমতঃ বস্ত্র-শিল্প-বিষয়ক শিক্ষার প্রতি অবহিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান এদেশে এই প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পে যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীর একান্ত অভাব। এই অভাব হেতু ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের উন্নতির পথ অনেক পরিমাণে অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এদেশে বস্ত্র-শিল্প বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের পরিচয় পাওয়া যায় না, বস্ত্র-শিল্পের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনের আগ্রহ দেখা যায় না। ফলে, ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের প্রাণের স্পন্দন ক্ষীণ এবং উহার অগ্র-গতি মন্থর রহিয়াছে। শিল্প বিষয়ে বিশেষশিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মী ভিন্ন শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোযোগী হইবে কে? আজ যদি এদেশের সর্ব্বত্র হাজার হাজার যুবক উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া বস্ত্র-শিল্পে প্রবেশ করে, তবে কালই তাহাদের চেষ্টা ও প্রেরণায় ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প সঞ্জীবিত এবং উহার উন্নতির পথ অধিকতর সুগম হইবে।

বর্ত্তমান ভারতে বয়ন-শিল্প-বিষয়ক শিক্ষার নিতান্ত গুরুত্ব হেতু যাহাতে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে ঐরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে পারে তৎপ্রতি স্বদেশহিতৈষী ভারতবাসীর ও শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া আবশ্যক। আমরা এখানে বস্ত্র-শিল্প-বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচনা করিতেছি।

বস্ত্র-শিল্প-বিষয়ক শিক্ষার ব্যাপকতা

বস্ত্র-শিল্প বলিতে সাধারণ লোকে কার্পাস, রেশম, পশম হইতে বস্ত্রাদির উৎপাদন কার্য্য বুঝিয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক অর্থে বস্ত্র-শিল্পের গণ্ডী এত সঙ্কীর্ণ নহে। বস্ত্র-শিল্প বলিতে কার্পাস, রেশম, পশম প্রভৃতির সূত্র হইতে কেবল মাত্র বস্ত্রাদির বয়ন নহে, বয়নের

পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অনেক বিষয় বুঝায়। কার্পাস, রেশম, পশম প্রভৃতির উৎপাদন হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ সকল জিনিষ হইতে সূত্র-প্রস্তুত, বস্ত্রাদির বয়ন এবং উৎপন্ন বস্ত্রাদি শেষে ক্রেতার হস্তে পৌছান পর্য্যন্ত নানা প্রকার কার্য্য, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বস্ত্র-শিল্পের অন্তর্গত। সুতরাং আধুনিক অর্থে বস্ত্র-শিল্পের গণ্ডী যে কত ব্যাপক, তাহা সহজেই অনুমেয়। বস্ত্র-শিল্পের এই ব্যাপকতা পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং নানা প্রকার আন্তর্জ্জাতিক প্রভাব ও শক্তির উদ্ভব হেতু বস্ত্র-শিল্পের ব্যাপকতা ও জটিলতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজ হয়ত এক দেশের উৎপন্ন কার্পাস হইতে অপর দেশে সূত্র প্রস্তুত হইয়া অপর কোন দেশের কলে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং সেই বস্ত্র বিদেশের নানা স্থানে প্রেরিত হইতেছে। বস্ত্রোৎপাদন সম্পর্কিত আধুনিক কল-কারখানা-সৃষ্টির পূর্ব্বে বস্ত্র-শিল্পের এতটা ব্যাপকতা ও জটিলতা ছিল না। আজ বস্ত্র-শিল্পের এই ব্যাপকতা ও জটিলতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কোন সুপ্রতিষ্ঠিত বস্ত্র-কলের পরিচালনা-কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা কঠিন। বস্ত্রের চাহিদার পরিমাণ, চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক প্রথায় উৎপাদন, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, প্রতিযোগিতার বাজারে বস্ত্রের বিক্রয় ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বস্ত্র-কল-পরিচালকের পক্ষে পরিচালনা-কার্য্যে অগ্রসর হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই সকল বিষয়ের সম্পর্কে নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তির উপর যথোচিত কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ ভিন্ন বর্ত্তমান পরিচালনা-কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। বস্ত্রোৎপাদনের সম্পর্কে, কাঁচামাল সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রস্তুত বস্ত্রের সর্ব্বশেষ বণ্টন পর্য্যন্ত বহু প্রকার বিষয় আধুনিক বস্ত্র-শিল্পের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে এবং বস্ত্র-

শিল্পীর পক্ষে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ঐ সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ এবং লব্ধ তথ্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা সুচিন্তিত কাৰ্য্যনীতি নির্দ্ধারণের শক্তি অর্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

উৎপাদন শিল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় হইলেও উহাই আদর্শ নহে। শিল্পের আদর্শ হইল ক্রেতার বাঞ্ছনীয় জিনিষের উৎপাদন এবং ন্যায্য মূল্যে উহার সরবরাহ দ্বারা ক্রেতার অভাবপূরণ। কোন ব্যবসায়ী শিল্প-প্রতিষ্ঠানই উৎপাদনের পর কার্য্য শেষ হইল মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। উৎপন্ন জিনিষ ক্রেতার হস্তে না পৌঁছান পর্য্যন্ত উৎপাদনের শেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সুতরাং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদনের পরবর্ত্তীকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য কোন প্রতিষ্ঠানের বণ্টন বা বিক্রয় বিভাগের উপর উহার লাভালাভ ও স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। উৎপাদনের পূর্ব্ববর্ত্তী কাঁচামাল-সংগ্রহ বিষয়টাও মোটেই উপেক্ষনীয় নহে। কাঁচামালের প্রাচুর্য্য-অপ্রাচুর্য্য, উৎকৃষ্টতা-অপকৃষ্টতা, মূল্যের হার ইত্যাদির উপর উৎপন্ন জিনিষের পরিমাণ, গুণাগুণ, মূল্যের হার এবং বিক্রয়ের পরিমাণ প্রধানতঃ নির্ভর করে, সুতরাং কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাঁচামাল সংগ্রহ বিষয়টার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া উৎপাদনে এবং উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয় বা ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নহে।

বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে একই কথা। বস্ত্রের উৎপাদন বস্ত্র-শিল্পের প্রধান বিষয় সন্দেহ নাই, কেন না, বস্ত্রের উৎপাদন ভিন্ন বস্ত্রের চাহিদা পূরণ করা যায় না। কিন্তু বস্ত্রোৎপাদনের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী নানা বিষয়ের সহিত বস্ত্র-শিল্প ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। কোন দেশের বস্ত্র-শিল্পকে সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে ঐ দেশের কার্পাস, রেশম, পশম প্রভৃতি জিনিষের উৎপাদন বিষয়টাকে মোটেই উপেক্ষা করা চলে না। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য দীর্ঘআঁশযুক্ত উৎকৃষ্ট

কার্পাসের উৎপাদন বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান আমেরিকা, মিশর হইতে ঐরূপ কার্পাস আমদানী করা হইয়া থাকে। যদি এদেশে ঐরূপ কার্পাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে আমাদের বস্ত্র-শিল্প অধিকতর সমৃদ্ধ হইত, সন্দেহ নাই। বিষয়টা বস্ত্র-শিল্পের গণ্ডীর বাহিরে নহে। অপর দিকে যে সকল দেশীয় ও আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক প্রস্তাব দ্বারা বস্ত্রের উৎপাদন ও বিক্রয় প্রভাবিত হইতেছে তাহাও ব্যবসায়ী বস্ত্র-শিল্পী উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিদেশীয় রাজনীতিক নির্ব্বাচন অথবা মুদ্রা বিনিময় হারের পরিবর্ত্তন, বিদেশীয় ঘরোয়া-বিবাদ বা আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ, কৃষি-শিল্পের আপেক্ষিক লাভালাভের হার, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ঘটনা, নূতন আইনের প্রবর্ত্তন ইত্যাদি বিষয় বস্ত্র-শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বসম্পন্ন পরিচালকের পক্ষে অবহেলা করা কঠিন। তাঁহার পক্ষে কেবলমাত্র উৎপাদনের এবং বণ্টনের ব্যবহারিক জ্ঞান যথেষ্ট নহে, ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁহার যথেষ্ট কার্য্যকরী জ্ঞান থাকা চাই।

বস্ত্র-শিল্প যেরূপ ব্যাপক, বস্ত্র-শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষাও তদ্রূপ ব্যাপক হওয়া আবশ্যক। এ কথার অর্থ এই নয় যে, বস্ত্র-শিল্পের প্রত্যেক কর্ম্মীর বস্ত্র-শিল্প-সংক্রান্ত সকল প্রকার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আদর্শের দিক্ হইতে উহা বাঞ্ছনীয় হইলেও কার্য্যতঃ উহা ঘটিতে পারে না। সকল কর্ম্মী ব্যাপক শিক্ষালাভের উপযুক্ত নহে, অথবা ঐরূপ শিক্ষালাভে ইচ্ছুক বা সমর্থ নহে। বিশেষতঃ বস্ত্র-শিল্প-সংক্রান্ত ব্যাপক শিক্ষালাভের সুযোগ এদেশে অত্যন্ত কম। বর্ত্তমান ভারতীয় যান্ত্রিক বস্ত্র-শিল্পের উৎপাদন-বিভাগের অধিকাংশ কর্ম্মী অশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত। তাহারা পূর্ব্বে কোনরূপ কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ না করিয়া বস্ত্র-শিল্পের কাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং কাজ করিয়া ক্রমশঃ দক্ষতা লাভ করিতেছে। এই বিপুল কর্ম্মী-বাহিনীর আবশ্যকতা

বস্ত্র-শিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। চিরদিনই অশিক্ষিত ও অল্প-শিক্ষিত লোক দ্বারা এই কর্ম্মী-বাহিনী গঠিত হইবে, সন্দেহ নাই, তবে ইহাদের মধ্যে যথোচিত শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করা হইলে অনেক প্রতিভাবান কর্ম্মীর উদ্ভব হইতে পারে। বহু কর্ম্মীর মধ্যে প্রতিভা সুপ্ত থাকিয়া যাইতেছে, যথোচিত সুযোগের অভাবে উহার জাগরণ ঘটিতেছে না। অধিকাংশ সাধারণ কর্ম্মী উৎপাদন-বিভাগের ক্ষুদ্রতর গণ্ডীর কর্ম্মে নিযুক্ত, সুতরাং তাহাদের কল্পনার গণ্ডীও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাহারা আত্মোন্নতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অনভ্যস্ত এবং যাহারা চিন্তা করে তাহারাও উন্নতির পথ খুঁজিয়া পায় না। শিক্ষা দ্বারা উহাদের কর্ম্ম-আবেষ্টনী প্রসারিত এবং উন্নতির পথ অধিকতর মুক্ত করা আবশ্যক। শিক্ষিত কর্ম্মী সম্মুখে বিস্তৃততর কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মোন্নতির সুযোগ দেখিতে পাইয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইবে। যাহারা উৎপাদন বিভাগের অন্তর্গত প্রাক্-বয়ন (Preparatory), বয়ন, রঞ্জন, প্রসাধন ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, তাহাদের জন্য এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক, যাহাতে তাহারা ক্রমশঃ সকল শাখার কর্ম্মে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হইয়া নিজের ও প্রতিষ্ঠানের অধিকতর উপকার সাধন করিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জন্য কতকটা সাধারণ শিক্ষার এবং বস্ত্র-শিল্প-সংক্রান্ত নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হইলে তাহারা অধিকতর উপকৃত হইবে। সাধারণ শিক্ষায় অধিকতর শিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত কর্ম্মীদের জন্যও বস্ত্র-শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক। তাহারা যাহাতে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া উহার বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধি এবং অপরদিকে নিজেদের আত্মোন্নতি সাধনে যত্নবান হইতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে উৎপাদন, বণ্টন এবং পরিচালনা বিষয়ে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা

বাঞ্ছনীয়। এই শ্রেণীর কর্ম্মীর উপর ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে, সুতরাং এই শ্রেণীর কর্ম্মী সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক। এদেশে বস্ত্র-শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত বিরল, সুতরাং এ বিষয়ে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পকেই বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। বস্ত্র-শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ সচেষ্ট হইলে আভ্যন্তরীণ কর্ম্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া মোটেই কঠিন হয় না। এমন কি বাহির হইতে আগত নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত ছাত্রের জন্য বস্ত্র-শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করাও অসম্ভব নহে। যে সময়ে এদেশের বহু শিক্ষিত যুবক জীবিকা অর্জ্জনের কোনরূপ সুযোগ দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছে সেই সময়ে তাহাদের কিয়দংশকে বস্ত্র-শিল্পের দিকে আকৃষ্ট করা হইলে তাহারা ত উপকৃত হইবেই, অধিকন্তু বস্ত্র-শিল্পের প্রাণেও নূতন স্পন্দন জাগিয়া উঠিবে।

আধুনিক ধারা

বর্ত্তমান এদেশের বিভিন্ন স্থানে বস্ত্র-শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার যে সামান্য ব্যবস্থা আছে তাহা অতি সাধারণ এবং আদর্শানুযায়ী নহে। প্রচলিত শিক্ষা দ্বারা শিল্পানুরাগী শিক্ষিত ছাত্রগণ আকৃষ্ট হইতে পারে না, এবং বস্ত্র-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে পারে না। প্রচলিত শিক্ষার আবশ্যকতা নাই, একথা বলা হইতেছে না। কথা এই যে, ভারতের বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারের জন্য বস্ত্র-শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার যে আদর্শ গৃহীত হওয়া উচিত, এদেশে সে আদর্শ এখনও স্থান পায় নাই। বস্ত্র-শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার আধুনিক ধারায় বিজ্ঞান, অনুসন্ধান ও গবেষণা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার বস্ত্র-শিল্প বৈজ্ঞানিক ও গবেষণামূলক শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিতেছে। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের শৈশব অবস্থায় উচ্চাঙ্গ

শিক্ষার আদর্শ গৃহীত না হইলেও চলিতে পারে, কেহ কেহ বলিতে পারেন। উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সংস্রবে কাজ করিবার জন্য যথেষ্ট-সংখ্যক কর্ম্মীর আবশ্যকতা অধিক, ইহাতে সন্দেহ নাই, এবং এই শ্রেণীর কর্ম্মীর জন্য উচ্চ বৈজ্ঞানিক ও গবেষণামূলক শিক্ষা অনাবশ্যক ইহাও সত্য। কিন্তু একথাও সত্য যে, বস্ত্র-শিল্প বিষয়ে আধুনিক উচ্চ শিক্ষার আদর্শ গৃহীত না হইলে বিশ্ব-প্রতিযোগিতার সম্মুখে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইবে না। আমরা চিরদিনই বিদেশ হইতে বস্ত্রাদি আমদানী করিব, বিদেশীয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার অনুকরণ করিব,—নিজেরা স্বাবলম্বী হইয়া যন্ত্র ও উৎপাদন-প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন করিব না, তীব্র-আশা ও আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ বর্ত্তমান ভারত একথা ভাবিতে পারে না। ভবিষ্যৎ ভারত কেবলমাত্র পৃথিবীর শিল্প-প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিবে না, ঐ প্রতিযোগিতায় আত্মশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবে—বর্ত্তমান ভারত এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছে। আমাদের শিল্প-শিক্ষার আদর্শকে এই আকাঙ্ক্ষার অনুবর্ত্তী করিয়া লইতে হইবে। বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধেও শিক্ষার উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রেট-বৃটেন

ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে বস্ত্র-শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার বিশেষ বিস্তার ঘটিয়াছে। লণ্ডন, ম্যাঞ্চেষ্টার ও গ্লাসগো এই তিনটি স্থানকে ঐরূপ শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল বলা যাইতে পারে। ম্যাঞ্চেষ্টার সহরের চতুর্দ্দিকে ৫০ মাইল স্থানের মধ্যে বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বিগত বিশ্ব-সমরের সময় হইতে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে এই শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। ইহার কারণ এই যে, ঐ সময় হইতে চীন, জাপান, ভারতবর্ষ ও

দক্ষিণ আমেরিকায় বস্ত্র-শিল্পের উন্নতির বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। উৎপন্ন বস্ত্রাদি এই সকল দেশে প্রেরণ করিয়া বৃটিশ বস্ত্র-শিল্প নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। ভবিষ্যতে ঐ সকল দেশের প্রতিযোগিতার সমক্ষে বৃটিশ বস্ত্র-শিল্প দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইবে কিনা, বৃটিশ বস্ত্র-শিল্প কর্তৃপক্ষের ইহা একটা প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কিরূপে বিদেশীয় বস্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই আজ বৃটিশ বস্ত্র-শিল্পের প্রধান সমস্যা।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য বৃটিশ জাতি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিশেষভাবে শিক্ষা বিষয়ে বিজ্ঞানের ব্যাপকতর প্রয়োগ, উন্নততর যন্ত্রপাতির ব্যবহার, নক্সা, ধরণ ও বর্ণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ এবং উন্নততর পরিচালনা কার্য্যের সাহায্যে কারিগরী ও ব্যবসায়িক নিপুণতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বৃটিশ বস্ত্র-শিল্পের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিক্রিয়া বেশ দেখা যাইতেছে। বৃটিশ বস্ত্র-শিল্পের কর্তৃপক্ষ কিছুকাল যাবৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুফলতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা অথবা বস্ত্র-শিল্প-বিষয়ক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেন না। তাঁহারা বস্ত্র-শিল্পের কর্ম্মীদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত অতি সাধারণ নৈশ-বিদ্যালয় অথবা তদনুরূপ অন্য প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কতকটা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন মাত্র। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সম্প্রতি তাঁহারা কার্পাস, রেশম, কৃত্রিম রেশম, পশম প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য বিরাট গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল গবেষণাগার পরিচালিত

করিতেছেন। এই পরিচালকদিগের অধিকাংশই বস্ত্র-শিল্প এবং এতদ্-সংক্রান্ত শিক্ষার সহিত পরিচিত নহেন।

ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে "সার্লি ইনষ্টিটিউট" নামে সর্ব্ববৃহৎ গবেষণা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের বিজ্ঞান-পরিষদ (Academy of Science) ঐরূপ গবেষণা-মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বৃটিশ বস্ত্র-শিল্পের ধুরন্দরগণ ঐ প্রস্তাবের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া বিজ্ঞান-পরিষদকে প্রস্তাবিত গবেষণা-মন্দির সম্বন্ধে তাহাদের পরিকল্পনা পেশ করিতে অনুরোধ করেন। সুতরাং বিজ্ঞান-বিশারদ ও বস্ত্র-শিল্পের নেতৃবর্গের দ্বারা একযোগে সার্লি ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এই গবেষণা-মন্দিরের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান পদগুলিতে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণকে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারা বস্ত্র-শিল্পের প্রক্রিয়া অথবা এতদ্বিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন না।

কার্পাস ও পশম সম্বন্ধে গবেষণার জন্য এই গবেষণা-মন্দির হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ১ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হয়। বৃটিশ বস্ত্র-শিল্পের প্রদত্ত অর্থ এবং গভর্ণমেণ্টের সমপরিমাণ দান দ্বারা এই গবেষণা-মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ, ত্রিনিদাদ, মিশর, দক্ষিণ আমেরিকা, চীন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্য যে সকল স্থানে প্রচুর কার্পাস জন্মে সে সকল স্থানে এই মন্দিরের শাখা পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। কার্পাস-আঁশের উন্নতির জন্য এই সকল শাখা পরীক্ষাগারে নানা প্রকার পরীক্ষা চলিয়া থাকে।

আধুনিক উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে ইহার পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কার্য্য সাধিত হয়। বস্ত্র-শিল্পের কর্ত্তৃপক্ষের অর্থ-সাহায্যে এই পরীক্ষাগারের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। গবেষণা-মন্দিরের মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারগণ রসায়ন-

শাস্ত্রী ও পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের পাশাপাশি, যাহাতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানের সর্ব্বোত্তম প্রয়োগ ঘটিতে পারে তজ্জন্য কাজ করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কার্পাস, রেশম ও পশম আঁশের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া সমস্যার সৃষ্টি এবং উহার সমাধান করেন। তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু কাল ধরিয়া বস্ত্র-শিল্পীদিগের অনেক অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন। উৎপাদন প্রক্রিয়ার নানাপ্রকার ত্রুটি সম্বন্ধে তাঁহারা নানাদিকে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। বস্ত্র-শিল্পের অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান এখন সহজেই হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকদিগের অধীনে অনেক কর্ম্মী বস্ত্রকলসমূহ পরিদর্শন করেন এবং পরীক্ষাগারে যে সকল সমস্যার সমাধান হইয়াছে তৎপ্রতি কলকর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এইরূপে বস্ত্র-শিল্পের সহিত বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় গবেষণার দিক্‌ দিয়া ঐ শিল্প অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ডে বণিক-সভার অর্থ-সাহায্যে পরিচালিত পরীক্ষাগারে কলসমূহের উপস্থাপিত বিষয়ের পরীক্ষা-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, উহা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা টেক্স্‌টাইল কলেজের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে নির্ব্বাহ হয় না।

কার্পাস-আঁশের যথোচিত ব্যবহার বিষয়ে ইংলণ্ডের টেক্স্‌টাইল বিদ্যালয়গুলি রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা এবং প্রাণী-বিজ্ঞানের উপর অধিকতর নির্ভর করিয়া থাকে। বিজ্ঞানের পঠনীয় বিষয় এরূপভাবে নির্দ্ধারিত হয়, যাহাতে বস্ত্র-শিল্পে উহার প্রয়োগ ঘটিতে পারে। পদার্থ-বিদ্যার ঐরূপ পঠনীয় বিষয়গুলি তিন বৎসরে শেষ করা হয়। আঁশ, বর্ণ, আলোকের ফল, কতকগুলি মূল প্রাকৃতিক নিয়ম ইত্যাদি বিষয়ে পদার্থ-বিদ্যার পাঠ স্থির করা হয়। ইংলণ্ডে কাগজ-প্রস্তুত-প্রণালীকে টেক্স্‌টাইল শিল্পের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হয়।

ইংলণ্ডে শিল্প-সম্পর্কীয় পরিচালনা কার্য্যের জন্য বিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রবণতা দেখা যায়। যাঁহারা কোন বিশেষ-শিল্পের পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে দুই বা তিন বৎসর ঐ শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্য্য ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে হয়। পরে তাঁহারা পরিচালনা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। বস্ত্র-শিল্পের পরিচালনা শিক্ষা সম্বন্ধেও ছাত্রগণকে বর্ত্তমান এই প্রথার অনুসরণ করিতে দেখা যায়। বস্তুতঃ বর্ত্তমান যথোচিত শিক্ষা লাভ ব্যতীত কেহই বস্ত্র-শিল্পের পরিচালকরূপে গণ্য হইতে পারে না।

ইংলণ্ডে শিল্পশিক্ষার সম্পর্কে ধন-বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের আবশ্যকতা বিশেষভাবে স্বীকৃত হইতেছে। বস্ত্র-শিল্পের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ দুই বিষয়ে ছাত্রদিগকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া হয়।

অধিকতর উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্বারা যাহাতে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস এবং প্রস্তুতি-প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধিত হইতে পারে তৎপ্রতি বৃটিশ বস্ত্র-শিল্পের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে সার্লি ইনষ্টিটিউটে যে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল যন্ত্রপাতি মেকানিক্যাল অথবা ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় না; কিরূপে বিভিন্ন অবস্থায় কার্পাস-আঁশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার হইতে পারে তাহা নিরূপণে বৈজ্ঞানিকদিগকে সাহায্যের জন্য ঐ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রেট বৃটেনের বৃহত্তর টেক্স্‌টাইল বিদ্যালয়গুলিতে বস্ত্রাদির নক্সা, প্রকার, বর্ণ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। যাহাতে ঐ সকল বিষয়ে ছাত্রগণের যথোচিত বোধ-শক্তির উন্মেষ ঘটে এবং

তাহারা সমাজের সহিত ঐগুলির অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধ বুঝিতে পারে, বিশেষভাবে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। নক্সা বিষয়ে নূতনত্ব সৃষ্টির দিকে ততটা দৃষ্টি দেওয়া হয় না, কেন না, উহা আর্ট স্কুলের শিক্ষার অন্তর্গত।

গ্রেট বৃটেনের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিল্প-সম্পর্কিত শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্ম্মীরা যাহাতে রাত্রিতে অথবা দিবসের কিয়দংশ সময়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতে পারে তজ্জন্য বিশেষভাবে ঐরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিভিন্ন শিল্প-সম্পর্কিত বহু বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়। ব্যাঙ্কিং হইতে ক্ষৌরকর্ম্ম, বয়ন হইতে রাস্তায় রেল বসান, মুদিশালার কর্ম্ম হইতে মাংসবিক্রেতার কার্য্য পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ বিদ্যমান। বয়ন-শিল্পের কর্ম্মীরাও রাত্রিতে অথবা দিবসের আংশিক সময়ে বিদ্যালয়ে যাইয়া আবশ্যক শিক্ষা লাভ করিতে পারে। শিল্প-সম্পর্কিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষাপদ্ধতি গভর্ণমেণ্ট ও শিল্প-সমিতিসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে।

এস্থলে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি গ্রেট বৃটেনের বয়ন-শিল্পের সহিত বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বয়ন-সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট ও বয়ন-শিল্প-কর্ত্তৃপক্ষ বয়ন-শিল্প সম্পর্কীয় শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ক্রমশঃ ঐ শিক্ষা অধিকতর ব্যাপক ও বিজ্ঞানমূলক হইয়া উঠিতেছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বয়ন-শিল্প এবং এতদ্‌সংক্রান্ত শিক্ষা সম্বন্ধে সামান্য অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, ঐ শিল্পের সহিত বিজ্ঞান ও

গবেষণামূলক শিক্ষার বিশেষ সংযোগ ও সহযোগ স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। কিরূপে বস্ত্রাদির উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যয় হ্রাস ঘটিতে পারে তৎসম্বন্ধে মার্কিণ বয়ন-শিল্পের কর্ত্তৃপক্ষ কিছুকাল ধরিয়া বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ফলে বয়ন-শিল্প-সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। মার্কিণ শিক্ষাবিদ্‌গণ বয়ন-শিল্প ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই সাহচর্য্যের প্রবণতা দেখিতে পাইয়া ঐ শিল্প সম্পর্কীয় শিক্ষাকে যথাসম্ভব বিজ্ঞান ও গবেষণামূলকরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, যদি বয়ন-শিল্পে উৎপাদন ও বিক্রয় সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণানীতির প্রবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে বয়ন-শিল্পের ছাত্রদিগের মনে ঐ ধারণা বদ্ধমূল করিতে হইবে, এবং ঐ শিল্প-সম্পর্কীয় প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে অনুসন্ধান ও গবেষণার ভাব প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। ছাত্রদিগকে কেবলমাত্র ব্যবহারিক কারিগরী শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে না, তাহাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিতে হইবে যে, বয়ন-শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক।

আমেরিকার অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্ত্রকলে কর্ম্মীদিগের শিক্ষার এরূপ বন্দোবস্ত রহিয়াছে, যাহাতে তাহারা ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সাহায্য করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের যে কোন ক্ষুদ্র মিলের কর্ত্তৃপক্ষ নিযুক্ত প্রত্যেক কর্ম্মীকে প্রথম অবস্থায় উৎপাদন ও বিক্রয় এতদুভয় বিভাগের কর্ম্মে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভের সুযোগ দিয়া থাকেন। পরে তাহাকে তাহার কৃতকার্য্যতা ও গুণানুসারে উৎপাদন-বিভাগের অথবা অফিসের কর্ম্মে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার মনে করেন, টেক্সটাইল

কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক-কর্ম্মীকে কোন বিভাগের ফোরম্যানের সহিত একযোগে কাজ করিবার স্থযোগ দেওয়া হইলে, পারস্পরিক সাহচর্য্য দ্বারা উভয়ের কার্য্যকুশলতা বর্দ্ধিত এবং প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। তিনি এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিক্রয় বিভাগের কার্য্য অনুসন্ধান ও গবেষণার ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অপর দিকে, অনেক বৃহত্তর বস্ত্রকলে যুবক-কর্ম্মীদের আবশ্যক শিক্ষার জন্য পাঠ্যবিষয় নির্দ্ধারিত ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্বারা আগন্তুক কর্ম্মী তাহার প্রবৃত্তি ও কার্য্যশক্তি অনুসারে নিজেকে বয়ন-শিল্পের বিশেষ কর্ম্মে উপযুক্ত করিয়া তুলিবার স্থযোগ পাইতেছে।

কিন্তু একথাও সত্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের বহু বয়ন-প্রতিষ্ঠানে এখন পর্য্যন্ত কর্ম্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই। তাই মার্কিণ শিক্ষাবিদ্‌গণ বলিতেছেন, যাহাতে বয়ন-শিল্পের কর্ম্মে যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত অধিক সংখ্যক যুবক প্রবিষ্ট হইয়া ঐ শিল্পের অগ্রগতির পথ মুক্ত করিতে পারে, তজ্জন্য শিক্ষা-সম্পর্কীয় নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা আবশ্যক।

আমেরিকায় বয়ন-শিল্পের শ্রমিকদিগের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধেও পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উহার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে। মার্কিন সাহিত্যে বিষয়টা "ধনিকদিগের নূতন সামাজিক দায়িত্ব" রূপে প্রতিফলিত হইতেছে। সাধারণ ভাষায় উহা শ্রমিকনিয়ন্ত্রণ-রীতির পরিবর্ত্তন বলিয়া সূচিত হইতেছে। এতকাল ওভারসিয়ার অথবা ফোরম্যানের হস্তে কর্ম্মীদিগের নিয়োগ, পরিচালনা এবং কর্ম্মচ্যুতির ভার ছিল, সম্প্রতি ঐ রীতির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। শিক্ষার দিক্ হইতে এই প্রবণতার উপর গুরুত্ব আরোপিত হইতেছে। শিক্ষাবিদ্‌গণ বলিতেছেন, টেক্সটাইল বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে

অধিকতর শিক্ষা দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ বিষয়টী ব্যবহারিক হইলেও উহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হইতেছে। আমেরিকার অনেক বয়ন-প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় প্রাচীন প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। ইহার অর্থ এই নহে যে, ওভারসিয়ার পদ উঠিয়া যাইতেছে—ইহার অর্থ হইতেছে, ভবিষ্যতে ওভারসিয়ারকে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সম্বন্ধে অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে কাজ করিতে হইবে।

বয়ন-শিল্পে আধুনিক যন্ত্রাদি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বয়নবিভাগের কর্ম্মীরা তাহাদের কার্য্যের যে রীতি অনুসরণ করিত, যন্ত্রাদি প্রবর্ত্তনের পর সেই রীতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে বয়নকারী তাহার নিজ দক্ষতা অনুসারে তাঁত পরিচালনা করিয়া বস্ত্রাদি বয়ন করিত এবং তাহার দক্ষতার উপর বস্ত্রাদির উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতা নির্ভর করিত। বর্ত্তমান সেই বয়নকারীর স্থানে একদল কর্ম্মী আধুনিক উন্নত ধরণের তাঁতের সাহায্যে কাজ করিতেছে। আধুনিক বয়নকারী বহু তাঁত নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। তাহার উপর বয়নের বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর কার্য্যে লিপ্ত একদল লোকের পরিদর্শনের ভার রহিয়াছে। এইরূপে আধুনিক যন্ত্র দ্বারা প্রাচীন বয়নকারীর কার্য্য-কুশলতা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এই অবস্থায় শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণের প্রাচীন রীতিও বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান বয়ন-শিল্পে যন্ত্রের সহিত কর্ম্মীর যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহার অধিকতর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইতেছে। সম্প্রতি বয়ন-শিল্প সম্পর্কীয় শিক্ষায় এই প্রবণতার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এবং অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানের কথা আলোচিত হইতেছে।

আমেরিকায় বস্ত্রাদির বিক্রয় ও বণ্টন সম্পর্কিত পূর্ব্বতন রীতির মধ্যেও পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। বিক্রয়ের জন্য বস্ত্রাদি কি ভাবে প্রস্তুত ও বাজারে উপস্থিত করিতে হইবে এবং কি প্রণালীতে উহা বিক্রয় করিতে হইবে, নূতন দিক্ হইতে এই বিষয় দেখা হইতেছে। কিরূপে বস্ত্রাদির উৎপাদক এবং শেষ ক্রেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপিত হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইতেছে। যে সকল ছাত্র সংখ্যা-বিজ্ঞান, সংগঠন-প্রণালী, বিক্রয়-নিয়ন্ত্রণ-রীতি, বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহারা বয়ন-প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে আদৃত হইতেছেন এবং ভবিষ্যতে অধিকতর প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন।

আধুনিক বয়ন-শিল্প-বিষয়ক শিক্ষার ধারা

বয়ন-শিল্পের আধুনিক প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকায় ঐ শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার সংস্কার সাধন করা হইতেছে। বয়ন-শিল্পের প্রবণতাকে প্রধানতঃ চারি ধারায় বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—(১) অনুসন্ধান ও গবেষণা (২) পরিচালনা (৩) নক্স্া, ষ্টাইল প্রভৃতি বিষয় এবং (৪) বিক্রয়। অনুসন্ধান ও গবেষণা অর্থে সমস্যার বিভাগ ও বিশ্লেষণ এবং সমগ্রভাবে উহার সমাধানের শক্তি বুঝায়। আধুনিক বয়ন-শিল্পে চিরন্তন প্রথার অনুসরণের দিন অতীত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে বিশ্লেষণ-মূলক তথ্যের সাহায্যে সমস্যা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার চেষ্টা দেখা দিয়াছে। আধুনিক পরিচালনা হইতে আমিত্ব ও স্বেচ্ছাচারমূলক কর্ত্তৃত্বের ভাব উঠিয়া যাইতেছে, এবং তৎস্থলে কর্ম্মীদের প্রতিষ্ঠার ভাব বদ্ধমূল হইতেছে। তাহা ছাড়া কর্ম্মীদের মানবতার প্রতি অধিকতর দৃষ্টিপাত করা হইতেছে। বর্ত্তমান বিক্রয়ের ভাবের সহিত ক্রেতাদের প্রয়োজন

ও চাহিদা অনুসারে বস্ত্রাদির উৎপাদনের ভাব সংযুক্ত হইতেছে। নক্সা ও ষ্টাইলের দিক্ হইতে বয়ন-শিল্পকে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রতীক চারুশিল্পরূপে গণ্য করা হইতেছে এবং ব্যবসায়ের সাফল্য ও কৃতকার্য্যতার পক্ষে মূল্য অপেক্ষা নক্সা, ষ্টাইল প্রভৃতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে উল্লিখিত ধারাগুলির সহিত বয়ন-শিল্প বিষয়ক আধুনিক শিক্ষার সংযোগ রক্ষার চেষ্টা চলিতেছে। বয়ন-শিল্পের ছাত্রকে উল্লিখিত প্রত্যেকটি ধারার সহিত পরিচিত এবং তৎসংক্রান্ত কর্ম্মে সুদক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্‌গণ প্রয়াস পাইতেছেন।

আদর্শ

বয়ন-শিল্প বিষয়ক শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে মার্কিণ শিক্ষাবিদ্‌গণ বলিতেছেন, ঐ শিক্ষা আংশিকভাবে ব্যবসায়িক, আংশিকভাবে এঞ্জিনিয়ারিং এবং আংশিকভাবে বস্ত্রাদির উৎপাদন বিষয়ক হইবে। সঙ্কীর্ণ অর্থে বস্ত্রকলের সাধারণ কার্য্য অপেক্ষা বস্ত্রাদির উৎপাদন ও বিক্রয়ের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়া বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষা-পদ্ধতি রচনা করা সম্ভব। বয়ন-শিল্পের ছাত্রদিগকে এঞ্জিনিয়াররূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রয়াস না পাইয়া শিল্প-পরিচালনার জন্য যেরূপ এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা আবশ্যক তদ্রূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইলে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। বয়ন-শিল্প সম্পর্কীয় প্রচলিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারিক শিক্ষার সহিত পরিচালনা-সংক্রান্ত শিক্ষার সংযোগ রাখিয়া যথোচিত শিক্ষা-পদ্ধতি গঠন করা ঐ শিল্পের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ("What is sought is a type of industrial education i. e. part business, part engineering and part textile practice. It is possible to

conceive a type of educational institution in which the curricula are developed with textile manufacturing and selling in mind rather than textile mill practice in the narrower sense. Textile education can be given such a sense of direction not by reading it towards engineering in the sense that we are training men to be engineers, but towards that part of engineering education generally called "industrial management". What the textile industry is seeking is the kind of training which keeps the best of the present vocational school base but to which is added the point of view and perspective of management".—Report on Textile Education by Frederick M. Feiker, 1934).

আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ডোহার্টি বলেন, আমার অনুমান এই যে, বয়ন-শিল্প সম্পর্কীয় শিক্ষার জন্য শিল্প-পরিচালনা বিষয়ে যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের আবশ্যকতা অত্যন্ত অধিক হইবে। তিনি আরও বলেন, সকল ছাত্রকে একই প্রকার শিক্ষা দিবার কথা বলা হইতেছে না। শিক্ষার জন্য ছাত্র-নির্ব্বাচনই প্রধান সমস্যা। প্রয়োজন অনুসারে লোক বাছিয়া লইয়া তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষা দুই ধারায় বিভক্ত হইবে। একদিকে বয়ন-শিল্পের সাধারণ কার্য্যের জন্য কর্ম্মী সৃষ্টি করিতে হইবে, অপরদিকে বয়ন-শিল্পের নেতা সৃষ্টি করিতে হইবে। বর্ত্তমান সাধারণ কর্ম্মী সৃষ্টির জন্য শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। নেতা বা পরিচালক সৃষ্টির সমস্যাই গুরুতর। উৎপাদন, ব্যবসায়, গবেষণা ও উন্নতির জন্য উপযুক্ত পরিচালক চাই। (My guess is that for textile education, the principal type of man most wanted would be close to the types of man most needed, would be close to the types graduated from the

Industrial Adminitration Course......It is not of course intended that the same individual would have the same training......The major problem is one of selection and recruiting. Define and find the type of men wanted and give them the appropriate training. That training would comprise programmes for two general types as I now see it in the light of other industries—one, the routine operatives, the other, the leaders. For the one, training is now probably well-provided. The other group is where the problem seems to lie—leaders in manufacturing business, research and development.)

পারিপার্শ্বিক অবস্থা

পারিপার্শ্বিক অবস্থা-ভেদে বয়ন-শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার ধারা বিভিন্ন স্থানে কতকটা বিভিন্ন হইতে পারে। বয়ন-শিল্প বিষয়ক 'এঞ্জিনিয়ারিং' বা 'ম্যানুফ্যাকৃচারিং' শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সকল স্থানে একপ্রকার হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বয়ন-শিল্পের প্রয়োজন এবং তৎ-সংক্রান্ত অবস্থার গুরুত্ব অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিশেষ শিক্ষনীয় বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে। শেষোক্ত বিশেষ শিক্ষার আবশ্যকতা খুব বেশী। রেশম, পশম, কার্পাস, পাট, শণ প্রভৃতির যে কোনটির গুরুত্ব যে স্থানে যত অধিক, সে স্থানে বয়ন-শিল্প সম্পর্কীয় শিক্ষার অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে ঐ বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণামূলক শিক্ষার আবশ্যকতাও তত বেশী। বাঙ্গালায় পাট-শিল্প সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। এক সময়ে এই প্রদেশ কার্পাস ও রেশম শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। এই দুই দিকেও আধুনিক বিস্তৃত শিক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। সরকার মনোযোগী হইলে শিক্ষার ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে। এ বিষয়ে বাঙ্গালার

বয়ন-শিল্প কর্ত্তৃপক্ষ ও বণিকসভাগুলির কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তাঁহাদের উৎসাহ ও প্রেরণায় বয়ন-শিল্প বিষয়ক শিক্ষার অধিকতর উন্নতি ঘটিতে পারে। বর্ত্তমান শ্রীরামপুরে ঐ শিক্ষা সম্পর্কীয় যে সরকারী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তথায় আধুনিক বিস্তৃত শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বাঙ্গালার নানা স্থানে নিম্নতর শাখা বিদ্যালয় স্থাপন করা হইলে এই প্রদেশের বয়ন-শিল্পের উন্নতির পথ অনেকটা অবারিত হইতে পারে। উচ্চতর বিদ্যালয়ে পাট, কার্পাস ও রেশম সম্বন্ধে যথাসম্ভব আধুনিক গবেষণা ও পরীক্ষামূলক শিক্ষা একান্ত আবশ্যক—একথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আবেষ্টনীগত অবস্থার পার্থক্য হেতু বিভিন্ন স্থানে উচ্চতর শিক্ষার পার্থক্য ঘটিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন ষ্টেটের বয়ন-শিল্প সম্পর্কীয় শিক্ষার সাহায্যে ঐ সকল ষ্টেটের বয়ন-শিল্পের এবং আনুষঙ্গিক কার্পাস, পশম প্রভৃতির উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে। আমাদের দেশেও ঐরূপ চেষ্টা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গালায় পাট-কল সমিতির চেষ্টায় পাট সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষামূলক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে ঐরূপ গবেষণা ও পরীক্ষার ফল ছাত্রগণের অধিগম্য হইতে পারে তজ্জন্য শিক্ষার বিস্তারসাধন কর্ত্তব্য। পাট বাঙ্গালার নিজস্ব সামগ্রী। পাট-শিল্পের বিস্তার ঘটিলে বাঙ্গালী কৃষক, শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোক উপকৃত হইবে। পাট সম্পর্কীয় পরীক্ষা ও গবেষণার সাফল্যের উপর পাটের ও পাট-শিল্পের বিস্তার ও উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এই দিকে দেশবাসীর অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। কার্পাস ও রেশম শিল্পের গুরুত্বও বাঙ্গালায় অল্প নহে। সুতরাং এই স্থানে বয়ন-শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার আবশ্যকতা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। আমাদের একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষা সম্বন্ধে আদর্শের উচ্চতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমাদের

দেশে এখন পর্য্যন্ত বয়ন-শিল্প সম্পর্কীয় উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই এবং শীঘ্র হইবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের ঐ শিক্ষার নিম্ন আদর্শ গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। উচ্চশিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করিয়া ঐ আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা পাইতে হইবে। বয়ন-শিল্প-সম্পর্কীয় উচ্চশিক্ষার পথে বাধা অনেক, সন্দেহ নাই। পরীক্ষা ও গবেষণা কার্য্যের পরিচালনার জন্য উপযুক্ত লোকের নিয়োগ এবং ঐরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য আবশ্যক অর্থ-সংগ্রহ কঠিন। তথাপি শিক্ষার উচ্চতম আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে হইবে।

বয়ন-শিল্প মানবের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পথে তাহার মনের উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করে নাই। একদিকে পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে সৌন্দর্য্য, ভব্যতা, মর্য্যাদা, ষ্টাইল ও ফ্যাসনের সৃষ্টি এবং অপর দিকে শৈত্য, তাপ ও আর্দ্রতা হইতে রক্ষা ও বহুবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবপূরণ এবং তৎসম্পর্কে নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবসায় সম্পর্কিত নব প্রক্রিয়া ও উপায়ের প্রবর্ত্তন মানবকে তাহার অগ্রগতির পথে পরিচালিত করিতেছে। এই সকল দিকে শিক্ষার বিশেষ সুযোগ বিদ্যমান। শিল্পের উন্নতি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষারই উন্নতি সূচিত হয়। যাহাতে এদেশে যথোপযোগী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক নূতন ভাবধারা ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বয়ন-শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, বয়ন-শিল্প সম্পর্কীয় শিক্ষাক্ষেত্রে তদ্রূপ চেষ্টার সময় বিশেষভাবে উপস্থিত হইয়াছে।

কর্ম্মবীর আলামোহনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীরঘুনাথ ঘোষ, বি. এ.

বহুদূর অতীতের শুভ এক সুবর্ণ-প্রভাত
আজি অকস্মাৎ
আঁখির সম্মুখে মোর উঠিল জাগিয়া।
বিস্মিত বিমূঢ় হিয়া—
মনে হ'ল, নবযুগস্রষ্টা—বুঝি নবীন শিবাজী—
ব্যথিতা ধরিত্রী 'পরে অবতীর্ণ আজি
বেঁধে দিতে ঐক্যসূত্রে অভেদাত্মা-জ্ঞানে,
উচ্চনীচনির্ব্বিশেষে সাম্য-মৈত্রী গানে;
অপরূপ মহাজাতি দেবজাতি করিতে সৃজন
জন্ম নিল আরবার; বঙ্গের অঙ্গণ
শঙ্খনাদে মুখরিত হ'ল অকস্মাৎ
জননীর দুঃখ-রাত্রি হইল প্রভাত।

নহে তূণ, অস্ত্র নয়, ওহে বীর যন্ত্র-পুরোহিত!
অন্ন লাগি' আর্ত্তনাদ, নিরন্নের বিদ্রোহের গীত
বাঁধিয়াছে সুমোহন যন্ত্রের সঙ্গীতে।
নীরবে নিভৃতে
রচিয়াছ মহাকাব্য নগরে তোমার
প্রতি ছন্দ ভাষা যার তুলিবে ঝঙ্কার
অনন্ত কালের বুকে। যুগ যুগ ধরে'
কহিবে সে, ওরে পান্থ, পথহারা ওরে,

এ নহে নগর শুধু, এ যে তীর্থধাম ;
এ তো শুধু কাব্য নয়, এ যে ওরে জীবন-সংগ্রাম।

ওহে ধ্যানী, কর্ম্মযোগী, সাধক মহান্,
ওহে বীর, স্রষ্টা ওহে, ওহে মহাপ্রাণ !
অবিশ্বাস্য ধৈর্য্য তব সাহস দুর্ব্বার,
অনিবার
নিরলস একাগ্র সাধনা,
দুর্জ্জয় সংগ্রাম-শক্তি, দিব্যদৃষ্টি, সুচিন্তিত নিখুঁত কল্পনা,
স্থির লক্ষ্যে অবিচল, নিঃশঙ্ক নির্ভয়,
জগতে রহস্য আজো, নিখিলের অপার বিস্ময়।
ধন্য তুমি প্রেমিক-সম্রাট্, শতাব্দীর মূর্ত্ত শাজাহান
তব নাম-গান
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নিত্য সুনীল অম্বরে,
দিকে দিগন্তরে।

ওহে কবি, কালিন্দীর কূলে গাঁথা স্ফটিকের সেই শুভ্রতাজ
মনে হয় আজ
আসিয়াছে রূপ ধরে' ভাগিরথী-তীরে।
ক্লান্তিহীন পরিশ্রমে ধীরে ধীরে বেদনার নীরে
আঁকিয়াছ কি যে ছবি নিঙাড়িয়া বক্ষ আপনার,
কহিতে স্বরূপ তার
কোথা ভাব, ভাষা কোথা, কোথা মোর ছন্দ ?
আনিয়াছি শুধু অর্ঘ্য, ঘুচে যাক্ দ্বন্দ্ব।

কর্ম্মবীর আলামোহন

শ্রীহরিহর শেঠ

—:•:—

সাহিত্যের মন্দিরে দীন সেবকরূপে মাতৃ-অর্ঘ্য রচনার জন্য অনেক অনুরোধ পেয়ে থাকি, কিন্তু বাংলার শিল্পী-ব্যবসায়ীদের জীবন সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে বা লিখ্‌তে হবে—এমন অনুরোধ কখনও পাই নাই। দুর্ভাগ্য আমাদের, এজন্য লিখ্‌তে বল্‌বার সুযোগই আমাদের নাই বল্‌লেই চলে। বঙ্কিম, রামমোহন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, কর্ণেল সুরেশচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক মনীষীর কথা মনে করে' বাঙ্গালী গর্ব্ব অনুভব করে' থাকেন। জাতির সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ ও জাতীয়তাক্ষেত্রে এঁদের দান অসামান্য, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ জাতিকে বাঁচ্‌তে হ'লে, সমগ্র সভ্য জগতের প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে দাঁড়াতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে যে বীরকে সম্মুখীন হ'তে হবে, আমাদের মধ্যে সে বীর কোথায়! বিদেশের রকফেলার, কার্ণেগীর কথাপ্রসঙ্গে আমাদের দু'পাঁচ জন দরিদ্রের সন্তান যাঁরা আপন চেষ্টায় সৌভাগ্যের উচ্চ সীমায় উঠেছেন তাঁদের কথা বলে' থাকি। তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের চরিত্র হ'তে শেখ্‌বার জান্‌বার অনেক কিছু আছে সত্য, কিন্তু এই মরণ-বাঁচন সমস্যার দিনে আমাদের সমক্ষে যে আদর্শ আবশ্যক তা' খুঁজে পাওয়া শক্ত। তাই আজ আমাদের মধ্যে কর্ম্মবীর আলামোহনের উদ্ভবে আমরা এত আশান্বিত, এত উৎফুল্ল।

আলামোহনের আদর্শ, তাঁহার দান যদি বিশ্বের কাছে কোনদিন অমূল্য বিবেচিত নাও হয়, তথাপি আমাদের কাছে তার মূল্য কম নয়। যখনকার যে সঙ্গীত, যে শক্তিসাধনা দরকার তারই চেষ্টা করতে হবে। সে জন্য আদর্শ আবশ্যক। আলামোহনের জীবন আমাদের সম্মুখে সেই আদর্শ। জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'তে হ'লে প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে জয়যুক্ত হ'তে হ'লে এই মহৎ চরিত্রের অনুসরণ করতে হবে।

পরাধীন জাতির রাজনীতি না থাকতে পারে। তাদের শিল্প-সাধনাক্ষেত্রও বিঘ্নসঙ্কুল নয় একথা কেহই বলবেন না। তথাপি যদি জাতির দৃষ্টি এদিকে পতিত হয় তা'হ'লে অচিরে আমাদের অবস্থা ভিন্নপথে ধাবিত হবেই। এই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীর সম্বন্ধে যে ভাব মনে আসে তাহা প্রকাশ করার মত সামর্থ্য আমার নাই। তিনি জাতির প্রতি ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ। তিনি এই মুমূর্ষু জাতির মধ্যে আরও কয়েকটি আলামোহন দিবেন না কি?

যুদ্ধকালে ভারতীয় শিল্প-শ্রমিক

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্।

শ্রমনিষ্ঠা

মূলধনওয়ালা নিয়োগকর্ত্তা ও শ্রমিকগণের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও শ্রমিকগণ যুদ্ধের সাহায্যের জন্য অদম্যভাবে ও পূর্ব্বাপর সমান তালে দ্রব্যাদি উৎপাদন করিয়া চলিয়াছে। শিল্পোন্নতির দিক্ দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে, আজ পর্য্যন্ত (১৯৪৪) যুদ্ধকে মোটামুটি তিন স্তরে ভাগ করা যাইতে পারে। যুদ্ধের প্রথম স্তরে মূলধনীরা উৎপাদন বৃদ্ধি ও যুদ্ধে দ্রব্যাদি সরবরাহের অর্ডার সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। যুদ্ধের এই অবস্থা কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তারপর যুদ্ধের দ্বিতীয় স্তর। এই স্তরে মূলধনীরা মনে করিয়াছিল, এই অবস্থা একদিন না একদিন পরিবর্ত্তিত হইবেই, কাজেই ভবিষ্যৎ শক্তির অনুগ্রহ লাভের জন্য কার্য্যপ্রণালীও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এই সময় মূলধনীরা দুইটি অজুহাতে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য গোপন করার নীতি অবলম্বন করিয়াছিল—প্রথম কয়লার অনটন, দ্বিতীয় সামরিক সরবরাহ। যুদ্ধের তৃতীয় স্তর এখনও চলিতেছে। এই স্তরে মূলধনীরা আবিষ্কার করিয়াছে যে, মিত্রশক্তির যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনাই অধিক। এখন তাহাদের অবলম্বিত পদ্ধতি তাহাদের মনোমত সফলতা আনয়নে অসমর্থ হওয়ায় তাহারা ফ্যাসিষ্ট পরিকল্পনার আশ্রয় লইয়াছে। এই পরিকল্পনা বোম্বাই প্ল্যানিংএ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। যুদ্ধের এই তিনটি স্তরে ভারতীয় শ্রমিকগণ প্রশংসনীয় আদর্শনিষ্ঠার

পরিচয় দিয়াছে। একদিকে তাহাদিগকে পণ্যদ্রব্যের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে চরম দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, আর একদিকে তাহাদের মূলধনী প্রভুদের নির্দ্দয় ব্যবহার সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রভুরা শ্রমিকদিগকে সাবেক মাহিনার বেশী বা দুর্ম্মূল্য ভাতা দিতে চায় নাই, অধিকন্তু তাহাদের আবশ্যকবোধে শ্রমিকের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছে। যেদিন সরকার শ্রমিকদিগকে বাঁচাইবার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করেন সেদিন মূলধনী অতিলোভী প্রভুদের অত্যাচার কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকগণ নিরুপায় হইয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে —কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অভিনব উপায়ে। শ্রমিকগণ উৎপাদন কার্য্য বন্ধ করে নাই, তাহারা অবিবেচক নিয়োগকর্ত্তাদের নিকট হইতে তাহাদের পারিশ্রমিক লওয়া বন্ধ করিয়াছিল। এই অবিবেচক প্রভুরা প্রতি বৎসর শ্রমিকদের শ্রমের গুণে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা লাভ করিত, কিন্তু তাহারা শ্রমিকদের আবেদনে কর্ণপাত করিত না। কলের মালিকদের প্রচুর লাভের যথেষ্ট প্রমাণ আছে—আয়কর, অতিরিক্ত কর, অতিরিক্ত লাভকর, অংশীদারদিগকে প্রদত্ত লাভ ও সামরিক অর্ডার হইতে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণই উজ্জ্বল প্রমাণ।

বোমাবর্ষণের সময় ভারতীয় শ্রমিকের যথার্থ স্নায়ুশক্তি ও উৎপাদন কার্য্যে দৃঢ় নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সে সময় যদিও কিছু কিছু শ্রমিক স্থানত্যাগ করিয়াছিল, তথাপি কোন অঞ্চলে শ্রমিকের অভাবে কলকারখানা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হয় নাই। সে সময় যদি কোন কলকারখানা বন্ধ হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য মালিকই দায়ী। কলিকাতার ডক-অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল এমন কি, সেখানেও দেখা গিয়াছে—একদিকে বোমাবর্ষণের ফলে ধ্বংস সাধিত হইয়াছে,

আর একদিকে দৃঢ়চিত্ত ভারতীয় শ্রমিক সবল ও অক্ষুণ্ণ হস্তে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই সময় যে সকল রাজনৈতিক দল শ্রমিকদিগকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়া তাহাদের প্রাণে বল সঞ্চার করিয়াছিল তাহাদের অবদান অস্বীকার করা বা বিস্মৃত হওয়া যায় না। সেই সময় খিদিরপুর অঞ্চলে ভারতীয় বলশেভিক দল যে কর্ম্মপটুতা দেখাইয়াছিল তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়।

শ্রমিকের শ্রেণীবিভাগ

যুদ্ধকালে বিভিন্ন অবস্থা, বিশেষভাবে সামরিক কাজের জন্যই শ্রমিকদিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। শ্রমিকদিগকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, প্রথম—যাহারা শ্রমশিল্পে নিযুক্ত, দ্বিতীয় যাহারা শ্রমশিল্পে নিযুক্ত নয়। যাহারা শ্রমশিল্পে নিযুক্ত তাহাদের মধ্যে আবার নূতন শ্রেণীবিভাগ আছে। আমি আপাততঃ শিল্প-শ্রমিক ও তাহাদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব কিন্তু তৎপূর্ব্বে, শিল্পকার্য্যে যাহারা নিযুক্ত নয় তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিয়া লইতেছি। যানবাহন বা আমদানী-রপ্তানী কার্য্য, পোষ্ট অফিস বিভাগ, টেলিগ্রাফ বিভাগ ও মিউনিসিপ্যালিটিতে নিযুক্ত শ্রমিক শিল্পশ্রমিক নহে। শিল্পশ্রমিক নহে এমন অনেকে "এসেন্‌সিয়াল সার্ভিসে"র (essential service) কোঠায় পড়ে। ট্রাম গাড়ীর কণ্ডাক্‌টার ও টিকেট কালেক্‌টার, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ পিয়ন, রেলওয়ে কুলি কতকগুলি সর্ত্ত পূরণ করিলে "এসেন্‌সিয়াল সার্ভিসে"র কোঠায় পড়ে।

শিল্পশ্রমিক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) টেক্‌নিক্যাল (technical) (২) নন-টেক্‌নিক্যাল (non-technical)। টেক্‌নিক্যাল শ্রমিকের সংজ্ঞা ও তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। টেক্‌নিক্যাল শ্রমিকের

তালিকার বাহিরের সমস্ত শ্রমিককেই নন্-টেক্‌নিক্যাল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

টেক্‌নিক্যাল শ্রমিকের সংজ্ঞা—"Technical Personnel includes all persons normally employed or declared by a Tribunal to be normally employed, in any of the capacities specified in the Schedule, and any such person, or class of persons undergoing training in any such capacity, as may be declared by the Central Government by notification in the official Gazette to be technical personnel for the purposes of this Ordinance; but does not include any person who is not liable under section 3 to undertake employment in the national service."

—Ordinance No. 11 of 1940.

টেক্‌নিক্যাল শ্রমিকের তালিকা

(ক) অপারেশান্যাল ষ্টাফ্ :—

(১) এয়ারক্র্যাফ্‌ট্ পাইলট, (২) য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট ওয়ার্কস্ ম্যানেজার, (৩) কেমিষ্ট্স্ (ইন্‌ডাষ্ট্রিয়্যাল, মেটালার্জ্জিক্যাল, য়্যানালিটিক্যাল, টেক্‌নিক্যাল), (৪) সিভিল এঞ্জিনিয়ারস্, (৫) ইলেকৃট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারস্, (৬) মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারস্, (৭) প্রোডাক্‌সান এঞ্জিনিয়ার্স, (৮) ওয়ার্কস্ ম্যানেজার।

(খ) সুপারভাইজরি ষ্টাফ্ :—

(১) য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট ফোরমেন, (২) চার্জ্জ হ্যাণ্ডস্, (৩) চার্জ্জ মেন, (৪) কেমিক্যাল প্রসেস্ ফোরমেন, (৫) গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার্স (এয়ারক্র্যাফ্‌ট্), (৬) ইন্‌স্‌পেক্টরস্, (৭) ইন্‌স্‌পেক্টরস্ অব্

মেটিরিয়্যাল্‌স্‌, (৮) লিডিং হ্যাণ্ড্‌স্‌, (৯) মাষ্টার টেইলর্‌স্‌ ও মাষ্টার কাটার্স, (১০) ওভারসিয়ার্স, (১১) ষ্টোরকিপার্স, (১২) সুপারভাইজিং মিস্ত্রি, (১৩) সুপারভাইজর্‌স্‌, (১৪) ভিউয়ার্স, (১৫) ওয়ার্কস্‌ কেমিষ্ট্‌স্‌, (১৬) ওয়ার্কশপ ফোরমেন।

(গ) নিপুণ বা অর্দ্ধ-নিপুণ পেশা ঃ—

(১) এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌ মেকানিক্‌স্‌, (২) আরমেচার উইণ্ডার্‌স্‌, (৩) আরমারার্‌স্‌, (৪) বিটার মিস্ত্রী, (৫) বেল্‌ট্‌মেন, (৬) ব্ল্যাক্‌-স্মিথ্‌, য়্যাঙ্গল্‌স্মিথ, স্প্রিংমেকার; (৭) বয়লার ক্লিনার, (৮) বয়লার মেকার, প্লেটার, (৯) বুট-স্থ মেকার, (১০) ব্রেজিয়ার, (১১) ব্রিক-লেয়ার, (১২) ব্রিক্‌মোল্ডার, (১৩) ব্রিক্‌-টাইল মেকার, (১৪) ব্রোঞ্জার, (১৫) কার্পেণ্টার, (১৬) কেমিক্যাল য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট, (১৭) কেমিক্যাল প্রসেস ওয়ার্কার, (১৮) কোচ্‌ ফিনিসার, (১৯) কম্‌পোনেণ্ট সেটার, (২০) কুপার, (২১) কপারস্মিথ্‌, (২২) কোর-মেকার, (২৩) ক্রেন ড্রাইভার, (২৪) কিউরিয়ারস্‌, (২৫) কাটার, (২৬) ডাই-সিঙ্কার, (২৭) ড্রাফ্‌ট্‌স্‌মেন, (২৮) ইলেক্‌ট্রিসিয়ান্‌, (২৯) ইলেক্‌ট্রোপ্লেটার, (৩০) এঞ্জিন ড্রাইভার, (৩১) এন্‌গ্রেভার, (৩২) ইরেক্‌টার, (৩৩) এষ্টিমেটার, (৩৪) এগ্‌-জামিনার, (৩৫) ফিটার, ভাইস্‌ম্যান; (৩৬) ফিটার (ব্রাস্‌ওয়্যার), (৩৭) ফিটার, (৩৮) ফারনেসম্যান্‌, ফায়ারম্যান, (৩৯) গ্যাল-ভানাইজার, (৪০) টুল ফিটার, (৪১) হ্যামারম্যান, (৪২) ইন্‌স্ট্রু-মেণ্ট্যাল মেকানিক্‌স্‌, (৪৩) লিড্‌ বার্ণার, (৪৪) লিথোগ্রাফার, (৪৫) লিথোপ্রিণ্টার, (৪৬) মেসিন মিস্ত্রী, (৪৭) মেসিনিষ্ট্‌, ড্রিলার, সেপার, মিলার, প্লেনার, পলিসার, গ্রাইণ্ডার; (৪৮) মার্কার, (৪৯) ম্যাসন, (৫০) মিল রাইট্‌, (৫১) মোটর মেকানিক্‌স্‌, (৫২) মোটর ম্যান, (৫৩) মোল্ডার, (৫৪) পেণ্টার, (৫৫) প্যাটার্ণ

মেকার, (৫৬) পেট্রল মেকানিক্, (৫৭) ফটো-লিথো-অপারেটর, (৫৮) প্রসেস্ ফটোগ্রাফার, (৫৯) প্রিসিসান গ্রাইণ্ডার, (৬০) প্রেস ওয়ার্কার, (৬১) প্রগ্রেসম্যান, (৬২) রেট্ ফিক্সার, (৬৩) রোপ-ওয়ার্কার, (৬৪) স্যাড্লার, (৬৫) সইয়ার, (৬৬) স্লটার, (৬৭) ষ্টোরমেন, (৬৮) সারভেয়ার, (৬৯) ট্যানার, (৭০) টিনস্মিথ, (৭১) টুলহার্ডেনার, (৭২) ট্রেসার, (৭৩) ট্রিম্নার, (৭৪) টুল-মেকার, (৭৫) টিউব ওয়ার্কার, (৭৬) টার্ণার, (৭৭) ভালকানিষ্ট্, (৭৮) ওয়েম্যান, (৭৯) ওয়েল্ডার, (৮০) হুইলার, (৮১) ওয়ারলেস অপারেটার, (৮২) ওয়ারম্যান, (৮৩) উড্ মেসিনিষ্ট্।

শিল্প-শ্রমিকদের নিজেদের উপকারের জন্য তাহাদের তালিকা ও অর্থ জানিয়া রাখা ভাল। ট্রাইব্যুন্যাল ১৯৪০ সালের ২নং অর্ডিন্যান্সের ১৯ ধারা অনুসারে ১, ২ ও ৩ ধারার অর্থ নোটিশবোর্ডে টাঙ্গাইয়া রাখার জন্য যে কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আদেশ দিতে পারে। এই বিজ্ঞাপন টাঙ্গাইয়া দেওয়ার পর শিল্প-শ্রমিক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত (কাজে নিযুক্ত অথবা শিক্ষাধীন) কোন ব্যক্তিই ট্রাইব্যুন্যালের লিখিত অনুমতি ব্যতীত তাহার কাজ অথবা শিক্ষাবিভাগ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। যদি কোন ব্যক্তি ট্রাইব্যুন্যালের অনুমতি ব্যতীত তাহার কাজ অথবা শিক্ষাবিভাগ পরিত্যাগ করে তবে তাহার কাজে অথবা শিক্ষাবিভাগে ফিরিয়া আসার জন্য ট্রাইব্যুন্যাল তাহাকে আদেশ দিতে পারে।

আবার নিয়োগকর্ত্তাদের সম্বন্ধেও ঠিক একই ভাবে বলা যায় যে, তাঁহারা ট্রাইব্যুন্যালের অনুমতি ব্যতীত কোন শিল্প-শ্রমিককে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন না। এই আইনের ফলে শিল্পক্ষেত্রে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়োগকর্ত্তাগণ শ্রমিকদের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন। ভারতীয় স্বেচ্ছাবাদী চিন্তাশীলগণ

(Lassaiz Faire) এই যুদ্ধের বাজারে প্রথম আঘাত পাইয়াছেন। এই আঘাত যে কেবল আইনের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে তাহা নহে, সামাজিক জীবনেও পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। বাধ্যতামূলক নিয়োগহেতু বহু শ্রমিককে সহরে বা সহরের নিকটে অথবা তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের নিকটে বাস করিতে হয়, ফলে তাহাদের অনেকের পরিজনকে নিজেদের নিকটে আনিতে হইয়াছে। এইভাবে সহর ও শিল্পাঞ্চলের লোকসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যবৃদ্ধি হেতু কতকগুলি শিক্ষিত শিল্পদক্ষ লোক তৈয়ারী হইয়াছে এবং ইহারাই ভবিষ্যতে ভারতের স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক হইবে।

শ্রমিকের গুরুতর সমস্যা

যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য তর্ তর্ বেগে বাড়িতে আরম্ভ করে এবং শ্রমিকদের জীবনধারণের ব্যয়-সমস্যা তীব্রতর হয়। তাহাদের বেতনবৃদ্ধি ও দুর্ম্মূল্য-ভাতা মঞ্জুরের জন্য প্রবল আন্দোলন হয়। যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং অতিলাভলোভী ও মজুতকারীদের দোষে খাদ্যাভাব ঘটে তখন অবস্থা চরমে উঠে। শ্রমিকদের সঙ্কট এমনই তীব্র হয় যে, সরকারকে 'চিপ্ গ্রেন শপ্' (সস্তায় খাদ্য-সরবরাহের দোকান) খুলিতে হয়। এই সকল দোকান হইতে সরকার-সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ তাহাদের বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য পাইত। ট্রামওয়ে, রেলওয়ে, পোর্ট ও ডকের কর্ত্তৃপক্ষ এবং কয়েকজন ইউরোপীয় কলমালিক অবিলম্বে গভর্ণমেণ্টের অনুসৃত ব্যবস্থা অবলম্বন করে। পরে অন্যান্য শ্রমিকগণ যাহাতে 'চিপ্ গ্রেণ শপ' ও নিয়মিত খাদ্য-সরবরাহের সুবিধা পায় সেজন্য আন্দোলন চলিতে থাকে। কারণ তাহারাও না খাইয়া কাজ করিতে পারিত না এবং প্রহসনবৎ

"কণ্ট্রোল্ড শপ্" বা চোরাবাজার হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া সময়-নিষ্ঠাও রক্ষা করিয়া চলিতে পারিত না। শ্রমিকদের অনেক অন্দোলন ও ঘাত-প্রতিঘাতের পর ভারতীয় কলওয়ালা ও পুঁজি-পতিগণ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও "চিপ্ গ্রেণ শপ" খুলিতে বাধ্য হয়। ১৯৪০।৪১ হইতে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত অবিরাম ধ্বস্তাধ্বস্তির পর দেখা গিয়াছে, বাংলাদেশে আংশিকভাবে ৫—১০ টাকা পর্য্যন্ত, কিন্তু আহ্মেদাবাদ ও বোম্বাইতে ১৫—২৩৲ টাকা পর্য্যন্ত দুর্ম্মূল্য-ভাতা দানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বাংলার পুঁজি-পতিদের যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর, কারণ যখন লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে আশ্রয়াভাবে শৃগাল-কুকুরের মত রাস্তায় রাস্তায় নিতান্ত করুণভাবে জীবনলীলা সংবরণ করিতেছিল তখন তাঁহারা শ্রমিকদের আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া নির্ব্বিকার ছিলেন। এই সময় নিতান্ত হীন স্বার্থের খাতিরে মানুষের স্বল্পতম দাবী পূরণের কোন চেষ্টা করা হয় নাই, ইহা অপেক্ষা সামাজিক অধঃপতনের সুস্পষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে। উপরে উক্ত কতিপয় বিবৃতি হইতে ভারতভূমিতে মার্কস্বাদের আবশ্যকতা বা অনাবশ্যকতা সহজেই উপলব্ধ হইবে।

জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যের তালিকা ও মূল্য

জীবনধারণের ব্যয় কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা ১৯৪৩ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেট হইতে উদ্ধৃত পরপৃষ্ঠার তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা প্রধানতঃ শ্রমিকদের জন্য, এবং তাহাদের জীবনধারণের মানের উপর নির্ভর করিয়া এই ব্যয় ধরা হইয়াছে।

কলিকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য (১৯৪৩)

দ্রব্যাদি	প্রাক্‌যুদ্ধকালে দাম প্রতিসের টাঃ আঃ পাঃ					প্রাক্‌যুদ্ধের ইন্‌ডেক্স	বর্ত্তমান দাম টাঃ আঃ পাঃ			বর্ত্তমান ইন্‌ডেক্স
ডাল	০	২	৪			১০০	০	৬	৭	২৮২
চিনি (দেশী)	০	৪	৬			,,	০	১৪	০	৩১২
লক্ষ্মী ও শ্রীঘৃত	১	৪	০			,,	২	১৩	০	২২৫
আটা	০	১	৯			,,	০	১৩	৯	৭৮৬
ময়দা	০	২	৩			,,	১	৪	০	৮৮৯
সরিষা তৈল	০	৬	৬			,,	০	১৩	৬	২০৮
মসলা	০	৫	১১			,,	০	১৩	৭	২৩০
কেরোঃ তৈল	০	১	৯	প্রতি	বোঃ	,,	০	৩	০	১৭১
লবণ	০	১	০	,,	সের	,,	০	২	৯	২৭৫
কয়লা	০	৮	০	,,	মণ	,,	১	৭	৬	২৯৩
মোটা কাপড়	১	১০	০	,,	জোড়া	,,	৭	১৪	৩	৪৮৪
চাল	৪	৬	$৪\frac{১}{২}$	,,	মণ	,,	২৪	৪	৬	৫৫২
দেশালাই	০	০	৩	,,	বাক্স	,,	০	০	$৬\frac{৩}{৪}$	১৮০
চা	০	৮	০	,,	পাউণ্ড	,,	১	৮	০	৩০০
দুধ	০	৪	০	,,	সের	,,	০	৫	০	১২৫

১৯৪৩ সালে টাকায় তিন সের দুধ পাওয়া যাইত, কিন্তু ১৯৪৪ সালে দুধ টাকায় দেড় সের। জুতার দামের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইহা ২॥০ টাকা হইতে ৮৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কেরোসিন তৈল দুষ্প্রাপ্য, উনান ধরাইবার বা একটা হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিবার মত আবশ্যক সামান্য পরিমাণ কেরোসিন পাওয়া যায় না বলিলেই চলে।

শ্রমিক সংক্রান্ত আইন

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার উভয়েই অডিন্যান্স জারি করিয়া শ্রমিকদের উপর নির্মম অবিচার দমনের চেষ্টা করিয়াছেন। আইন-জারির ফলে অনিচ্ছুক নিয়োগকর্ত্তারা শ্রমিকদের আবেদন বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়াছে। এসব বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট ধনতান্ত্রিক অাওতায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট যে সব আইন জারি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য— (১) The Essential Services (Maintenance Ordinance, 1941). (২) The Ordinance No. IX of 1943 with regard to the War Risks Insurance of Factories. (৩) The Ordinance No. XXXI of 1943 which is to control the dismantling of the factories by the mill-owners, (৪) Ordinance No. XXXVIII of 1942 which has amended the National Service (Technical Personnel) Ordinance No. II of 1940. এই সকল আইন ব্যতীত ভারতরক্ষা-বিধানে নিয়োগকারীদের অবিচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বাংলা সরকারের লেবার কমিশনার যেখানেই শ্রমিকের যথার্থ অভিযোগ দেখিতে পাইয়াছেন সেখানেই তিনি

শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকের অভিযোগ দূরীভূত হয় নাই—যেমন বার্মা শেল কোম্পানীর শ্রমিকের অভিযোগ। ইহার প্রধান কারণ, মূলধনী নিয়োগকর্ত্তাদের প্রভূত ক্ষমতা। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসরণে শাসনযন্ত্রের গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তিত না হইলে দরিদ্র শ্রমিকদিগকে যথার্থ সাহায্য দান করা সম্ভব হইবে না। রাষ্ট্র যেদিন লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্তের আহার ও আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করিবে, রাষ্ট্র যেদিন তাহাদের সন্তানদের অন্নবস্ত্র-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে সেদিনের জন্য তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

কর্ম্মবীর আলামোহন

শ্রীশশধর বিশ্বাস, কবিভূষণ

প্রতিভার বরপুত্র কর্ম্মবীর হে আলামোহন !
"আশ্চর্য্য প্রদীপ" সম মনে হয় তোমার সৃজন।
জীবন-যাত্রার পথে কীর্ত্তি তব শুভ্র সুমহান্
বিভ্রান্ত জাতিরে দিল নব এক পথের সন্ধান।

অর্থহীন ফেরীওয়ালা দৈন্য শুধু ছিল তব পুঁজি,
ঐশ্বর্য্যের গূঢ় নীড়ে প্রবেশিলে ভাগ্য সনে যুঝি' !
সহরের দীর্ঘপথ, নভে জ্বলে মধ্যাহ্ন-ভাস্কর—
"মুড়ি চাই !" হাঁকিয়াছ, প্রাণে বাজে আজ সেই স্বর।

সেদিন চিনিনি তোমা, তব পানে চাহি নাই ফিরে,
সহস্র লোকের ভিড়ে শ্রান্ত পদে চলে গেছ ধীরে।
মাথাটী গুজিতে ঠাঁই ছিল নাক, ভাড়াটিয়া বাড়ী,
জোটে না ভাড়ার কড়ি, বাড়ীওয়ালা করে কড়াকড়ি।

একান্তে দাঁড়ালে যবে নেমে এসে পথের ধূলায়
সেদিনও কাঁদিনি মোরা হে মহান্ ! তোমার ব্যথায় !
নির্ম্মম সহরে হায় ! কেবা কাঁদে কাহার লাগিয়া
একা তুমি সয়েছিলে একার বেদনা, রজনী জাগিয়া।

আকাশ-কুসুম সম কল্পনার বিচিত্র সুষমা
সুসভ্য সমাজে আজ অকস্মাৎ চিনায়েছে তোমা।
পরের দাসত্ব-লোভী শক্তিহীন অলস বাঙ্গালী
তোমার প্রশংসা গানে দুলে দুলে দেয় করতালি।

কর্ম্মের শাহানশাহ্ গড়িয়াছ কর্ম্মের যে "তাজ"
বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশে সত্য-সমচির-দীপ্ত আজ।
তাই তব জন্মদিনে উৎসবের মহাসমারোহ,
আশীষ-চন্দন সহ পুষ্পমাল্য দেয় কেহ কেহ।

একান্তে দাঁড়ায়ে আজ আমি দীন ভাষাহীন কবি
কথার তুলিকা দিয়ে আঁকিয়াছি এই তব ছবি।
এ মহা আনন্দ-দিনে লহ এই ক্ষুদ্র উপহার—
তার সাথে সহ বীর ভক্তিপূর্ণ প্রণতি আমার !

যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের খনিজ শিল্প

অধ্যাপক শ্রীশিবসুন্দর দেব, ডি.এস্-সি.

(বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

সমস্ত দেশীয় রাজ্য লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষের খনিজ-সম্পদের হিসাব নিকাশ লওয়া বা ইহার বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতার সম্বন্ধে আলোচনা করা, কি যুদ্ধ কি শান্তি উভয় কালের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। যুদ্ধোত্তর কালের সমুন্নতির জন্য ভারতীয় খনিজ শিল্প ও খনিজাত দ্রব্য সম্পর্কিত যে কোন গঠনমূলক শিল্প সম্বন্ধে পরিকল্পনা তৈয়ারী করিবার পূর্ব্বে, সমগ্র পৃথিবীর খনিজ পদার্থের দিক্ দিয়া ভারতবর্ষের অবস্থা কি— এই প্রশ্নই স্বতঃই সকলের মনে উদিত হওয়া উচিত।

বিবিধ সামরিক দ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য লৌহ, লৌহ ছাড়া অন্যান্য ধাতব খাদ ইত্যাদি যে সকল খনিজ দ্রব্য আবশ্যক হয়, তাহাদের অধিকাংশই ভারতবর্ষে যথেষ্ট আছে। কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিষ যে প্রচুর পরিমাণে আছে একথা বলা যায় না। টিন (tin), টঙ্গষ্টিন (tungsten), সীসা (lead), দস্তা (zinc), নিকেল (nickel), গ্রাফাইট (graphite) ও পেট্রোল (petroleum) ভারতবর্ষে যথেষ্ট নাই। কিন্তু লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ (manganese), য়্যালুমিনিয়াম (aluninium) ও ক্রোমিয়াম (chromium) এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে। এদেশে অভ্র (mica) ও ইলমেনাইট (ilmenite) যথেষ্ট পরিমাণে

আছে এবং বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এই দেশে আছে। এদেশে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ খুব বেশী। এদিক্ দিয়া একমাত্র রাশিয়ার (U.S.S.R) সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে; মনে হয়, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তমগুণসম্পন্ন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ এই দেশেই আছে। উপরোক্ত পদার্থ অপেক্ষা কিছু কম মূল্যবান পদার্থ (যেমন—asbestos, cement, fertiliser—সার, clays, নানাবিধ লবণ) এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং তাহাতে এদেশের অভাব পূরণ হইতে পারে। এই সব দ্রব্যের কোন কোনটি আমাদের অভাব মোচন করিয়াও বিদেশী রপ্তানী করিতে পারা যায়।

উৎকৃষ্ট লৌহের উপাদানের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর বিশিষ্ট সম্পদশালী দেশগুলির অন্যতম। সিংহভূম ও ময়ূরভঞ্জ জেলায় লৌহের বিশাল ক্ষেত্র আছে। ভারত সরকারের জিওলজি-ক্যাল সার্ভে বিভাগ কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, এই অঞ্চলে ৩০০ কোটি টন উত্তম লৌহ উপাদান (ore) পাওয়া যাইতে পারে: এই উপাদানে (hematite) শতকরা ৬০ হইতে ৬৯ ভাগ উত্তম লৌহ আছে। Sir Cyri Fox (Late Director, Geological Survey of India) বলিয়াছেন—এই বিপুল পরিমাণ লৌহ-উপাদান গলাইবার মত উপযুক্ত পরিমাণ কয়লা এদেশে নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন কয়লা খনিতে ১৫০ কোটি টন খনিজ দ্রব্যের কাজের যোগ্য কয়লা (metallurgical coking coal) আছে। যেভাবে কয়লা খরচ হইতেছে তাহাতে এই কয়লায় মাত্র ৫০ বৎসর চলিতে পারে। এই জন্য Mineral and Geological Institute of Indiaর সভ্যগণ একটা মতলব স্থির করিয়াছেন। সেই মতলব হইতেছে এই—যখন ভারতের কয়লা নিঃশেষ হইবে, তখন ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে বিনিময়-রীতি (barter system)

দ্বারা লেন-দেন ব্যবস্থা স্থাপন করা উচিত; তাহাতে ভারতের লৌহ-উপাদান অষ্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি হইবে এবং অষ্ট্রেলিয়ার কয়লা ভারতে আমদানী হইবে; যতদিন না ভারতের non-coking কয়লা হইতে ধাতব শিল্পের উপযোগী (metallurgical) কয়লা পাওয়ার উপায় আবিষ্কার হয় ততদিন এই ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে।

পূর্ব্বে অনেকবার অনেক ভূতত্ত্ববিদ্ ও খনিশাস্ত্রী ভারতের coking coal সংরক্ষণ-সমস্যার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই সমস্যার দিকে কেহই মনোযোগ দেন নাই। কেবলমাত্র রেলওয়েতে বৎসরে ৭০ লক্ষ টন ভাল কয়লা খরচ হয়। যদি এই কয়লা হইতে খনিজ শিল্পের উপযোগী কয়লা তৈয়ারী করা হয়, তাহা হইলে ইহা হইতে ৮৭,৫০০ টন য়্যামোনিয়াম সালফেট এবং ধাতব শিল্পের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ কোক্ (coke) পাওয়া যাইতে পারে। গিরিডি জেলার কয়লায় ফস্ফরাস কম থাকে, এই কয়লা ধাতব শিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (Indian Science Congress) কাশী অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণের মধ্যে স্যার আরদেশীর দালাল বলিয়াছেন, "কয়লা নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে, ঝরিয়ার কয়লাক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কয়লাক্ষেত্রের সম্পূর্ণ রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক পরিমাপ লওয়া আবশ্যক, সেই সঙ্গে কয়লা সদ্ব্যবহারের গবেষণার জন্য একটা পরিকল্পনাও হওয়া প্রয়োজন।" ঝরিয়ার কয়লাখনির ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ সংখ্যক স্তরের কয়লা সম্পর্কে অতি সত্বর অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক এবং যাহাতে এই কয়লা কেবলমাত্র ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত হয় সেজন্য আইন প্রণয়ন হওয়া উচিত। ভারত সরকার শীঘ্রই ধানবাদ খনি বিদ্যালয়ে জ্বালানি সম্পর্কে একটি গবেষণাগার স্থাপন করিবেন এবং আশা করা যায়, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কয়লা সম্পর্কে এখানে গবেষণা

চলিবে। অত্যন্ত বেশী উত্তাপে কয়লা বিশ্লেষণ (carbonisation) করিলে কতকগুলি উত্তম আনুষঙ্গিক পদার্থ (by-product) পাওয়া যায়। এই সকল পদার্থ উদ্ধারের দিকে ঝরিয়া ও গিরিডির কয়লা অঞ্চলে তেমন কেহ মনোযোগ দিতেছেন না। রাণীগঞ্জের কয়লা অতিশয় সহজ-দাহ্য। কিন্তু এই কয়লা হইতেও কোন আনুষঙ্গিক পদার্থ বাহির করা হইতেছে না। ইহার কারণ সুস্পষ্ট—আনুষঙ্গিক পদার্থের আবশ্যকতা আজ পর্য্যন্ত কেহ অনুভব করে নাই। ঝরিয়ার উত্তম পোড়া কয়লা হইতে ধাতব শিল্পের উপযোগী কয়লা উৎপাদনই কয়লাক্ষেত্রের মূলধনীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কাজেই দেখা যায় যে, রাণীগঞ্জের কয়লায় সহজ-দাহ্য পদার্থ যথেষ্ট থাকিলেও কোন আনুষঙ্গিক পদার্থের শিল্প আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই। Geological Survey of Indiaর ডাঃ দত্ত রায় দেখাইয়াছেন যে, রাণীগঞ্জের কয়লা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ আল্‌কাতারা (tar) পাওয়া যায়, এবং এই কয়লা ৯৫০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে বিশ্লেষণ করিলে যথেষ্ট পরিমাণ গ্যাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই কয়লা বিশ্লেষণের অনুপযুক্ত (non-coking) বলিয়া ইহা ধাতব শিল্পের পক্ষে তেমন উপযোগী নহে। রাণীগঞ্জের কয়লা আবার পারিবারিক ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইট পোড়ান ইত্যাদি কাজে ইহা কতখানি উপযোগী সে বিষয়েও গবেষণা হওয়া উচিত। আজ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ গ্যাস কোম্পানি রাণীগঞ্জের কয়লা ব্যবহার করে, ইহাতে আনুষঙ্গিক পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। রাণীগঞ্জের বিভিন্ন স্তরের কয়লা হইতে কি পরিমাণ আল্‌কাতারা ও গ্যাস পাওয়া যায় তাহা পরপৃষ্ঠার তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ৯৫০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে বিশ্লেষণের ফল দেওয়া হইল।

	কোক্ coke	টার Tar	প্রতি টনে গ্যাস ঘন ফিট	য়ামোনিয়াম সাল্‌ফেট প্রতিটনে পাউণ্ড
দিশারগড়	৬২.৯০%	৫.৪০%	১২,২০০	২৬.৪৬
পারবালিয়া	৬৩.৪০%	৫.৬২%	১২,৪৬০	২৬.৩১
সামলা	৬৩.৮৮%	৫.৩৬%	১২,৩৮০	২৭.১০
পানিয়াটি	৬৫.১৮%	৫.২০%	১১.৮০০	২৪.৯৬

উপরে উদ্ধৃত সংখ্যা হইতে ইহা স্পষ্টীকৃত হয় যে, রাণীগঞ্জ-অঞ্চলে আনুষঙ্গিক পদার্থের কারবার আরম্ভ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। অন্যান্য বহু শিল্পে আল্‌কাতারা ও গ্যাস কাজে লাগান যাইতে পারে। রাণীগঞ্জের কয়লা হইতে যে প্রচুর পরিমাণ য়্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট পাওয়া যাইতে পারে তাহাতে সার-শিল্প উন্নত হইতে পারে। সার-শিল্প উন্নত হইলে কেবল যে বাংলার ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির সুযোগ ঘটিবে তাহা নহে, পার্শ্ববর্ত্তী যে সকল প্রদেশে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, অথচ উপযুক্ত পরিমাণ সারের অভাবে কোন জিনিষই যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হইতেছে না, সে সকল প্রদেশও লাভবান্ হওয়ার সুবিধা পাইবে।

ঝরিয়ার কয়লা-অঞ্চলে যথেষ্ট উত্তম কয়লা আছে। এই কয়লার স্তর কাটিবার সময় প্রণালীর দোষেই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বহু পরিমাণ কয়লা নষ্ট হইয়া যায়। অনেক সময় কয়লার খাদে আগুন ধরিয়া যায় অথবা কয়লার স্তর ধ্বসিয়া পড়ে। সর্ব্বাপেক্ষা দোষনীয় ব্যাপার এই যে, আপাত লাভের আশায় নিম্ন স্তর হইতে উৎকৃষ্ট কয়লা কাটিয়া লওয়া হয় এবং উপরের স্তরে প্রায়ই হাত দেওয়া হয় না, ফলে উপরের স্তর ধ্বসিয়া পড়ে, নতুবা আগুন ধরে। এইভাবে নিকৃষ্ট

জাতীয় কয়লা নষ্ট হইয়া যায়। বিশাল অঞ্চলে ও রেলওয়েতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্য, বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন- ও বিস্তার-কেন্দ্রে যাহাতে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় প্রকার কয়লাই ভাল ভাবে কাজে লাগিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার জন্য বিহার-সরকার মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই সময় বিহার-সরকারে কংগ্রেস-শক্তি প্রবল ছিল। কয়লার খনি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অল্পমূল্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্য যাহাতে কয়লার খনি অঞ্চলে বিশাল আকারে বিজলী-শক্তি-উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বসান যায়, সে বিষয়েও কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়াছিলেন। বিহারের শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এইচ্. কে. সেনের প্রেরণায় বা তাগিদে বিহার-সরকার পুনরায় সেই পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিতেছেন। ডাঃ সেন বহুপ্রকার কয়লা, বিশেষভাবে ধাতব শিল্পের অনুপযোগী কয়লা অল্প উত্তাপে বিশ্লেষণ (carbonisation) করিয়া দেখিয়াছেন। যদি উপরোক্ত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে লো টেম্পারেচার কোক্ (low temperature coke) ও আল্কাতারা যথেষ্ট বিক্রয় হইবে, এবং বিভিন্ন প্রকার গ্যাসও পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে হাইড্রোজেনেশানের (hydrogenation) যন্ত্রপাতি বসাইবারও সুবিধা হইতে পারে। কারণ, ইহার সহিত তরল ইন্ধন শিল্পের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে ১৫॥০ কোটি টাকা মূল্যের ৪৫ কোটি গ্যালন তরল ইন্ধন আমদানী হয়, ইহার মধ্যে ২ কোটি টাকা মূল্যের ১৫ কোটি গ্যালন জ্বালানি তৈল ছিল। এই আমদানী ইন্ধন ব্যতীত ভারতের আসাম ও আটক (পাঞ্জাব) তৈলখনি হইতে বৎসরে ১০ কোটি গ্যালন ক্রুড্ পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। ভূতত্ত্ববিদ্গণ বিশ্বাস করেন, নিকট ভবিষ্যতে ভারতের কোন নূতন তৈলখনি হইতে তৈল পাওয়ার

সম্ভাবনা নাই। এই অবস্থায় অন্য উপায়ে তৈল পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বিশ্লেষণ (distillation) করিলে প্রতি টন গোন্দ্‌ওয়ানার কয়লা হইতে এক গ্যালন বেন্‌জল (Benzol) পাওয়া যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বৎসরে মোটামুটি ৩ কোটি টন কয়লা খনি হইতে উঠিত। যদি সমস্ত কয়লাই অতঃপর বিশ্লেষণ করা হয়, তবে বৎসরে ৩ কোটি গ্যালন বেন্‌জল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা জানি, ঝরিয়া ও গিরিডির কয়লা-খনি অঞ্চলে দ্বাদশটি প্রতিষ্ঠানে মাত্র এক দশমাংশ অর্থাৎ ৩০ লক্ষ টন কয়লা বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু যদি সমস্ত কয়লাই অধিক, অনধিক ও অল্প উত্তাপে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে ২ কোটি টন কোক্ ও ধূমশূন্য ইন্ধন, ১৫ কোটি গ্যালন টার, ৬৷৷০ কোটি টন ক্রুড্ (অপরিষ্কৃত' বেনজল, ২৮,০০০ কোটি ঘনফুট গ্যাস এবং ৬,৬০,০০০ টন য়্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্ পাওয়া যাইতে পারে। ডাঃ সেন বলিয়াছেন, এখন বৎসরে এদেশে ২৬,০০০ টন য়্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্ তৈয়ারী হয় এবং ৭৬,০০০ টন আমদানী হয়। মোটামুটি বলা যায় যে, এখন বৎসরে কোক্ ও ধাতব শিল্পে প্রায় ৪০ লক্ষ টন উত্তম কয়লা খরচ হয়, এই কয়লা হইতে ৫০,০০০ টন য়্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যথার্থতঃ ২৬,০০০ টন প্রস্তুত হইতেছে। এই কম পরিমাণ য়্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্ প্রস্তুতির কারণ সম্ভবতঃ ভারতে প্রস্তুত সাল্‌ফিউরিক্ য়্যাসিডের অভাব।

উন্মুক্ত বাতাসে soft coke তৈয়ারী করিতে বৎসরে ১৫ লক্ষ টন কয়লা লাগে। যদি আবদ্ধ আব্‌হাওয়ার মধ্যে এই কয়লা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় এবং সমস্ত গ্যাস সংরক্ষিত করা যায়, তাহা হইলে ১৮০ লক্ষ গ্যালন ইন্ধন তৈল ও ১৪৫ লক্ষ গ্যালন মোটর স্পিরিট

ব্যতীত ১০,০০০ টন অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্‌ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ধূমশূন্য ইন্ধন, আল্‌কাতারা, বেন্‌জল ইত্যাদি তৈয়ারীর জন্য আজ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা হয় নাই। আমার যতদূর জানা আছে তাহাতে বলিতে পারি, ভারতীয় কয়লার হাইড্রোজেনেশানের (hydrogenation) জন্য আজ পর্য্যন্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টা হয় নাই, এবং এদেশে প্রতি গ্যালন মোটর-ইন্ধন তৈয়ারীর উপর দশ আনা শুল্ক বসান আছে।

ভারতের বর্ত্তমান খনিজ শিল্পের অন্যতম প্রধান দোষ এই যে, ম্যাঙ্গানিজ ওর (manganese ore), মাইকা ক্রোমাইট (mica chromite), ইলমেনাইট্‌ (ilmenite), সিলিম্যনাইট্‌ (sillimanite), কায়ানাইট (kayanite), মোনাসাইট (monasite sand) প্রভৃতি খনিজ পদার্থের অধিকাংশ ভাগই বিদেশে রপ্তানী করিয়া দেওয়া হয়। যদি আর ১০।১৫ বৎসর ধরিয়া ভারতের স্বভাবজ খনি-সম্পদ্‌ এই ভাবে বাহিরে রপ্তানী হইয়া যাইতে থাকে, তবে ভারতবর্ষ মূল্যবান্‌ মৌলিক ধাতু ও সাহায্যকারী খনিজ সম্পদ্‌ হইতে বঞ্চিত হইবে। ভারতবর্ষ হইতে এখন বহু পরিমাণ খনিজ সম্পদ্‌ বিদেশে চালান যাইতেছে, ফলে এদেশ পাকা মাল (finished goods) তৈয়ারীর লাভ হইতেও বঞ্চিত হইতেছে। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশ ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহের মূল কেন্দ্র বলিয়াই জানে। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী গত ৩০ বৎসরে ভারতের উপকূল হইতে অত্যন্ত অল্প মূল্যে ২ কোটি টন উত্তম খনিজ উপাদান বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। ভারতের মূল্যবান্‌ খনিজ সম্পদ্‌ যাহাতে বিদেশে আর রপ্তানী না হয় সেজন্য আইন প্রণয়ন হওয়া আবশ্যক। নতুবা কিছুদিন পরে যখন ভারতে তাহার খনিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার আরম্ভ হইবে তখন তাহাকে রাশিয়া অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে অতি উচ্চ মূল্যে খনিজাত উপাদান

লইয়া আসিতে হইবে। জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির (National Planning Committee) খনি- ও ধাতুবিদ্যা শাখার চেয়ারম্যান মিঃ ডি. এন্. ওয়াদিয়া বলিয়াছেন—জাতীয় খনিজ-শিল্পোন্নতির পরিকল্পনার মধ্যে নিম্নের বিষয়গুলি বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

১। সমস্ত মৌলিক বা প্রধান (key) খনিজ কাঁচা মালের অপ্রতিহত রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ।

২। এদেশে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় খনিজাত দ্রব্য ও ধাতুর অভাব সেই সব জিনিষের আনুপাতিক বিনিময় ব্যতীত যে কোন প্রকার ধাতব উপাদান রপ্তানী বন্ধ।

৩। খনিজ ও ধাতব পদার্থের আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ স্থিরীকরণ ও তাহার উপর উপযুক্ত শুল্ক আদায় সম্বন্ধে সুচারু আইন স্থাপন।

৪। রপ্তানীর পূর্ব্বে কতকগুলি কাঁচা মাল হইতে পাকা মাল তৈয়ারীর দেশীয় চেষ্টা।

৫। এদেশে খনিজ দ্রব্য হইতে পাকা মাল তৈয়ারীর সুবিধার জন্য বিনা খরচে খনিজ শিল্প-সম্বন্ধীয় সংবাদ ও পরামর্শ দানের ব্যবস্থা দান।

শেষোক্ত বিষয়ের সৌকর্য্যার্থে একটি উপযুক্ত যন্ত্রপাতি- ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য-সমন্বিত খনিজ-গবেষণা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া উচিত। জানা গেল যে, বোর্ড অব্ সায়েন্টিফিক্ য়্যাণ্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ (Board of Scientific and Industrial Research) জামসেদপুরে একটি জাতীয় ধাতব পরীক্ষাগার স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। যদি খনিজ-গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ঐ স্থানে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে গবেষকগণ শিল্পক্ষেত্রে খনিজ ও ধাতুর ব্যবহার সম্পর্কে পরীক্ষা ব্যাপারে যথেষ্ট সুবিধা ও সাহায্য পাইবেন। ভারতে

যুদ্ধোত্তর খনিজ-শিল্পোন্নতির পরিকল্পনায় নিকৃষ্ট উপাদানেরও যথেষ্ট সুযোগ আছে, কাজেই পরীক্ষাগারে নিকৃষ্ট উপাদানের গবেষণারও ব্যবস্থা থাকা উচিত।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রুর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিকল্পনা সংসদ (National Planning Committee) গঠিত হইয়াছে। ইহার উনত্রিশটি সাব-কমিটি অর্থাৎ শাখা সমিতি আছে। ইহার কাজ আপাততঃ বন্ধ আছে এবং সম্পর্কিত কাগজ-পত্রাদিও আটক অবস্থায় আছে। উক্ত সাব-কমিটিগুলির সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে অতিশয় মূল্যবান্। এই সাব-কমিটিগুলিতে দেশের দুইশত বড় বড় শিল্প-দক্ষ ব্যক্তি ও বিজ্ঞানবীর আছেন। আশা করা যায়, শীঘ্রই ভারতের রাজনীতিক সঙ্কট দূর হইবে এবং এই সকল সাব-কমিটির সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুদ্ধোত্তর ভারতের শিল্প-পরিকল্পনা প্রস্তুত হইবে। যদি যুদ্ধকালেই পরিকল্পনা ও পুনর্গঠন কাজ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ভারতের খনিজ-শিল্প নিঃসন্দেহে উন্নত হইবে।

আর্থিক ব্যাপারে নৈতিক প্রশ্ন

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্. এ., বি. এল্.

সম্পাদক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্

বর্ত্তমান সময়ে এমন একটা অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বতন নৈতিক আদর্শ অনেক ক্ষেত্রে বাতিল বলিয়া বোধ হয়। কিছু দিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি চমৎকার গল্প বাহির হইয়াছিল। তাতে দেখান হইয়াছে যে, সাধারণ কেরাণী বা এই রকম অন্য চাকুরীজীবী বা ব্যবসায়ী তাদের পূর্ব্ব অবস্থায় রহিয়াছে, অথচ যুদ্ধের কৃপায় অনেক নূতন চাকরী ও ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাতে লিপ্ত ব্যক্তিগণ অনেক বেশী উপার্জ্জন করিতেছে। দেখা যায়, যারা বেশী অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে তাদের অনেকেই বিদ্যা, বুদ্ধি বা চরিত্রবত্তায় কোন প্রকারে উর্দ্ধতর স্তরের নয়। সুতরাং মানুষের মনে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন সহজ নহে।

গত মহাযুদ্ধের সময়ও কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ অসম্ভব রূপ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের তুলনায় তা কিছুই নয়। বেশী মাহিনার এত নূতন নূতন চাকরী সে-সময় সৃষ্ট হয় নাই। একদিকে অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু, অন্যদিকে নব নব ব্যবসায়ে বিপুল অর্থোপার্জ্জন, প্রায় রাতারাতি বড়লোক হওয়ার দৃশ্য—এভাবে চোখে পড়ে নাই। এত মিথ্যার আশ্রয়, কপটতা, উৎকোচ-গ্রহণও দেখা যায় নাই।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আকস্মিকভাবে অনেক গুণহীন ব্যক্তিকে বিত্তশালী করিয়াছে। আমরা একটু চোখ চাহিয়া দেখিলেই বুঝিব, আমাদের সমগ্র সমাজজীবনে কিরূপ বিপ্লব ঘটিতেছে; উপরের লোক নীচে নামিতেছে, নীচের লোক উপরে উঠিতেছে। যদি সমস্ত লোক সমান সুযোগ পাইত, তা হইলে কোন কথা ছিল না। ফট্‌কা বাজারে খেলার মত সর্ব্বত্র একটা ভাগ্যের খেলা দেখা যাইতেছে। কেহ কেহ এই কথা বলিবেন, যোগ্যতার মাপকাঠি বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। যে উপরে উঠিতেছে, তার বিশেষ গুণ ও যোগ্যতা আছে বলিয়াই উঠিতেছে। তুমি কেন মনে কর, প্রচলিত বিদ্যাবুদ্ধির মানই একমাত্র মান? সাহসের সঙ্গে নূতন পথে অগ্রসর হওয়া, তার জন্য সকল প্রকার পরিশ্রম (এমন কি হীনতা) স্বীকার, (সৎ উপায়েই হোক্ আর অসৎ উপায়েই হোক্) প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া—এগুলিকে গুণ বলিয়া স্বীকার করিলে আর কোন গোল থাকে না।

যুদ্ধের আগে যে লোহাওয়ালারা কষ্টে ব্যবসা চালাইত, তাদের অনেকে আজ লক্ষপতি হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য এয়োরোড্রোম নির্ম্মাণের কণ্ট্রাক্ট লইয়াও অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। এরূপ উদাহরণ অনেক দেওয়া চলে। অথচ হাজার হাজার ভদ্র শান্ত চাকুরীজীবীর অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। সৎপথে অবস্থিত অনেক ব্যবসায়ী চোখে অন্ধকার দেখিতেছে।

সুতরাং আজ নৈতিক আদর্শ বিপন্ন, একথা অস্বীকার করা চলে না। এ কথার অর্থ নাই বলিয়া উহা উড়াইয়া দিলে সত্যকে অস্বীকার করা হইবে মাত্র। কারণ, ভালোই হউক আর মন্দই হউক, বর্ত্তমান সময়ে সমাজের কর্ত্তৃত্বের দায় বিত্তশালী লোকের হাতে গিয়া পড়িতেছে। জোর যার মুলুক তার—আদিম সমাজের কথা। বর্ত্তমান সমাজে জোরের জায়গায় অর্থ বসান যায়। সমাজে

যদি ইঁহাদের প্রতিপত্তি শুধু অর্থের জন্য না হইত, তা হ'লে কোন কথা থাকিত না। অর্থোপার্জ্জনের প্রণালীটা তুচ্ছ করিবার মত বস্তু নয়, কারণ উহা শুধু উপার্জ্জকের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, সমগ্র সমাজ-জীবনকেও করে। একটা কথা হয়ত এরূপ বলা হইবে যে, যারা বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই, যারা জীবন-যুদ্ধে পরাজিত, তারাই বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিরোধী ও সমালোচক। ইহা কতক পরিমাণে সত্য হইলেও একথা জোর করিয়াই বলিতে হইবে যে, অন্যায়ভাবে প্রভূত-অর্থোপার্জ্জনকারী সমাজপতিদের দৃষ্টান্ত লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোকের পক্ষে মারাত্মক এবং একদিনের জন্য নয়, বহু দিনের জন্য। নিরবধি কালের কষ্টি-পাথরে জীবন-যাত্রার ধারাকে যাচাই করিয়া লইতে হইবে বৈ কি।

একথাও সত্য নয় যে, অর্থশাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্রীর নিকট নৈতিক প্রশ্নের কোন স্থান নাই। আসলে প্রত্যেক বিজ্ঞান বা বিদ্যা আমাদের মনের রঙে অনুরঞ্জিত। আমরা সমাজকে যে লক্ষ্যস্থলে পৌছাইয়া দিতে চাই, তাই আমাদের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া দেয়। এত বড় ইংরেজ অর্থশাস্ত্রী মার্শ্যাল, যিনি হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁর আর্থিক মহাভারতে খৃষ্টান ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে একটুও দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই। পিগুর মত চিন্তাবীর ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদকে স্বতঃসিদ্ধ ও মঙ্গলজনক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। লর্ড কেইন্‌স্ সমূহতন্ত্রবাদী সমাজকে আদৌ স্বীকার না করিয়া বহু কার্য্যকরী পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আজকার দিনে কোন সমাজবৈজ্ঞানিক নীতিঘটিত প্রশ্নকে আর্থিক ব্যাপার হইতে বাদ দিতে পারেন না।

জাতির মেরুদণ্ডকে শক্ত করা দরকার। কিন্তু সেই শক্তি অর্জ্জন করা কঠিন সাধনার বিষয়। আজ পথে প্রলোভন এত বেশী,

পথ এত পিচ্ছিল যে, পদে পদে পতনের সম্ভাবনা। প্রশ্ন হইবে, সমগ্র জগতে যখন নৈতিক আদর্শ ম্লান, তখন ক্ষুদ্র, ভীরু, দুর্ব্বল বাঙ্গালীর পক্ষে সেই প্রশ্নকে বড় করিয়া দেখিবার প্রয়োজন কি? গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

কিন্তু নিরবধি কাল বড় নিষ্ঠুর কষ্টিপাথর। এই কষ্টিপাথরে ঘসিয়া একদিন জাতির মূল্য নির্ণীত হইবে। আপাত সফলতার আনন্দে প্রদীপের নীচের অন্ধকারের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। যে খাদ্যের অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিল, তা উচ্চতম দরে বিক্রয় করিয়া কেহ কেহ কোটিপতি হইতে দ্বিধা করে নাই। অনেক অসরল পথে বহু ব্যক্তি বিস্তর উপার্জ্জন করিয়া দশজনকে চোখ রাঙ্গাইতেছে। কিন্তু তা মনুষ্যত্ব নয়। তা শেষ কথাও নয়। অর্থশাস্ত্র চাহে দারিদ্র্য দূর করিতে, দেশের ঐশ্বর্য্য বহু গুণ বৃদ্ধি করিতে, কিন্তু জাতির মধ্যে কতকগুলি অমানুষ সৃষ্টি করিয়া ও তাদের প্রাধান্য বাড়াইয়া দিয়া নহে। যা সত্য ও মঙ্গলের পথ, অর্থোপার্জ্জনের বেলাতেও তা ত্যাগ করা চলিবে না। সৎ পথেই জাতীয় জীবনকে প্রবাহিত করিতে হইবে। তাতে আপাতত যত ক্ষতি হোক্, ভবিষ্যতে জাতিকে দৃঢ় ও উন্নত করিবে।

বাংলার কৃষি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়

অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, এম্. এস্-সি.

কৃষিজাত সম্পদের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,—(১) নিজের ভূমি-উৎপন্ন কৃষি-সম্পদ্ যাঁহাদের আছে তাঁহারা ও (২) তাদৃশ দ্রব্যসম্পদ্ যাঁহাদের নাই তাঁহারা। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম সম্প্রদায়ের যুদ্ধ-পরিস্থিতি হেতু সাধারণ দুরবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য পরিস্থিতি ও গ্রহণীয় কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

যাঁহাদের কৃষিজাত সম্পদ্ আছে এমন মধ্যবিত্তগণের বহু ভাগ আছে। কাহারও অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, কাহারও কোনরূপে দিন চলিয়া যায়, কাহারও বা তেমন চলে না, কেহ বা কেবলমাত্র ঐ সম্পদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া আনুষঙ্গিক ভাবে সামান্য ব্যবসায়, চাকুরী প্রভৃতি দ্বারা অল্প বা বেশ কিছু উপায় করেন। কেহ স্বয়ং জমি চাষ করেন, কেহ বা বর্গা-প্রথায় জমি চাষ করাইয়া উৎপন্ন শস্যের অংশ গ্রহণ করেন ইত্যাদি। যাহা হউক, আর্থিক স্বচ্ছলতার দিক্ দিয়া এই সকল মধ্যবিত্ত লোকদিগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়,—(১) উচ্চ মধ্যবিত্ত, (২) মধ্য মধ্যবিত্ত ও (৩) নিম্ন মধ্যবিত্ত। উচ্চ মধ্যবিত্তগণের মধ্যে কেহ কেহ বর্ত্তমান যুদ্ধপরিস্থিতির সুযোগে বেশ কিছু অর্জ্জন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা আর মধ্যবিত্ত না থাকিয়া সম্ভবতঃ ধনীর পর্য্যায়েই পড়িবেন। আর অনেকেই আছেন যাঁহাদিগকে ব্যয়ের মাত্রা অধিক হইলেও আর্থিক অভাবের মধ্যে পড়িতে হয় নাই। উঁহাদের সম্বন্ধে এখানে বলিবার কিছু নাই। যে সব মধ্যবিত্ত ব্যক্তির সংসার কষ্টে চলিতেছে

এবং যে সব নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঁচিয়া আছেন বটে, কিন্তু দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছেন তাঁহাদের সম্বন্ধেই কিছু বলিতেছি।

গ্রাম্য পাঠশালা, মধ্য ইংরাজী ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অল্প বেতনের শিক্ষক, গ্রামের দোকানের কর্ম্মচারী, গ্রামের পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার, গ্রামের জমিদারের তহশীলদার প্রভৃতির আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। অনেক স্থলে ইঁহাদের সামান্য জমি আছে। তাহা হইতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বর্গাপ্রথায় চাষের দ্বারা যাহা আয় হইত, তাহা হইতে সম্বৎসরের আহার্য্যের ব্যয় আংশিক সঙ্কুলান হইত। চাকুরী দ্বারা যাহা কিছু অর্জ্জিত হইত তাহাতে অন্য ব্যয় সঙ্কুলান হইত। আজ তাহাদের কি অবস্থা! চাকুরী দ্বারা যাহা আয় হইত তাহা বর্ত্তমান কার্য্যতঃ কিছুই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু ব্যয় চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুতরাং অলঙ্কারাদি যাহা ছিল তাহা বিক্রয় করিতে হইয়াছে, কোথাও বা বাধ্য হইয়া ভূসম্পত্তিও বিক্রয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা দুই এক মাসের ব্যাপার নহে যে তাঁহারা পরে আবার সাম্‌লাইয়া লইবেন। বৎসরের পর বৎসর এইরূপ চলিতেছে। রোগ হইলে রোগীর পথ্য সংগ্রহের পয়সা নাই, ডাক্তার ডাকিবার ক্ষমতা ত নাই-ই। মজুরের মজুরী চতুর্গুণ, ষষ্ঠগুণ, অষ্টগুণ বাড়িয়া গিয়াছে; কৃষকের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যও তিন, চারি বা পাঁচ গুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু ঐ সমস্ত শিক্ষক প্রভৃতির আয় কার্য্যতঃ কিছুই বাড়ে নাই। মজুর, কৃষক প্রভৃতির জন্য অনেক দরদের কথা শুনা যায়, কিন্তু এই সব মধ্যবিত্তদের জন্য সহানুভূতির কথা কদাচিৎ আলোচিত হইতে দেখা যায়। অনেক পরিকল্পনার কথা শুনা গিয়াছে, কিন্তু ইঁহাদের উন্নতির কথা কোন পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পাইয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

এই সব ব্যক্তিদের অপেক্ষা যাঁহাদের অবস্থা একটু ভাল তাঁহাদের অনেকে হয়ত স্থানান্তরে কার্য্যোপলক্ষে থাকেন। ইঁহাদের একটি বিশিষ্টাংশ কলিকাতায় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, অফিসে কেরাণী-গিরি, দোকানে কর্ম্মচারী প্রভৃতির কাজ করেন এবং সেজন্য কলিকাতা বা সহরতলীতে ইঁহাদিগকে বাস করিতে হয়। কাহারও পরিবার পরিজন সঙ্গে থাকেন, কাহারও গ্রামের বাড়ীতে থাকেন। ইঁহাদের যে কষ্ট কম তাহা নহে। ইঁহারা উত্তরাধিকারসূত্রে যে দৈহিক শক্তি পাইয়াছিলেন এখন তাহা ক্ষয় করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। মা ষষ্ঠীর অনুগ্রহগুলি পুষ্টির অভাবে যতই লঘু হইতেছে, নিগ্রহের ভার ততই গুরু হইতেছে। যৌবনটা ইঁহাদের কাছে অলীক স্বপ্ন হইয়াছে, অকালে বার্দ্ধক্যের অবসাদ ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে, জীবনসন্ধ্যার বিভীষিকা ইঁহাদের প্রফুল্লতাকে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়াছে।

যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ মর্ম্মন্তুদ অবস্থার উদ্ভব হইলেও যুদ্ধই ইহা ঘটাইয়াছে, না, মানুষেই ইহা ঘটাইয়াছে, না, মধ্যবিত্তগণের অদৃষ্ট ইহা ঘটাইয়াছে তাহা কে বলিবে? দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যেন সকলে একত্র হইয়াই এই ব্যাপার সাধন করিয়াছে। ইহা হইতে আপাততঃ উদ্ধার পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। আশাই মানুষের জীবন। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, অনেকেই ইহা আশা করিতেছেন—যুদ্ধ সমাপ্ত হইলেই সকলের সব দুঃখকষ্ট দূরীভূত হইবে। কিন্তু মানুষ আর অদৃষ্টকে তাড়াইবে কে? যুদ্ধ কবে শেষ হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আর যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইলে যে আবার শীঘ্রই নূতন আর একটি যুদ্ধ আরম্ভ হইবে না, তাহাই বা কি করিয়া বলিতে পারি। আর যদি যুদ্ধের শীঘ্র পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা না ঘটে, তাহা হইলেও যুদ্ধোত্তর কালে মধ্যবিত্তগণের অবস্থা যে

আপনা-আপনিই উন্নত হইয়া যাইবে এইরূপ আশা করা যায় না। দেশের অবনতি আর তথাকথিত উন্নতি যাহাই ঘটুক্ না কেন, মধ্যবিত্তগণ যেন দুঃখকষ্টের জন্যই প্রস্তুত থাকেন। দুঃখকষ্টের পরিমাণ সাময়িক কম বা বেশী হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় শীঘ্রই যে ইহার লাঘব ঘটিবে তাহা আমার মনে হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি কোন উপায় নাই? নিরুপায়ের উপায় যিনি, মনে মনে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়। মধ্যবিত্তগণকে বহির্দ্বার বন্ধ করিতে হইবে—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য। গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পিত বুলি, কংগ্রেসের সদুপদেশ, হাভুড়ি-কাস্তের সাম্যবাদ, নিষ্কর্ম্মার বাগাড়ম্বর, এ সব কর্ণকুহরে স্থান দেওয়া দূরে থাকুক, কর্ণের প্রান্তভাগেও যেন তাঁহারা না আনেন। তাঁহারা আত্মশক্তির উপর নির্ভর করুন, আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করুন, সকল আত্মায় যিনি আত্মা, যিনি বিপদ্‌ভঞ্জন তিনি অবশ্যই শক্তি সঞ্চার করিবেন। তিনি সকলকেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন, ভাবী বিপদ্ নিবারণ করিবেন। সুতরাং তাঁহার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবেই।

তবে কি সকলেই হাত পা গুটাইয়া পরমাত্মার ধ্যান করিতে থাকিবে? না, তাহা নহে। পৃথিবী যেরূপ কোটি কোটি যোজন দূরে থাকিয়াও ধ্রুবনক্ষত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিও সেইরূপ ভগবানের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া নিজের সাংসারিক কর্ম্ম করিবেন এবং সেই সঙ্গে যথাশক্তি দেশের ও দশের হিতসাধনে যত্নবান্ হইবেন।

ব্যাপারটি জটিল হইলেও দিক্‌দর্শনের মত বলিতেছি যে, নিজের দেহ ও মনের উন্নতি জন্য, আত্মশক্তির স্ফুরণের জন্য সংযম ও

অনলসতা অভ্যাস করিতে হইবে এবং ভরণ-পোষণের জন্য প্রধানভাবে গো-পালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। গৌণভাবে অন্য যাহা কিছু সম্ভব হয় করিতে হইবে। ভরণ-পোষণের জন্য কোনও দৈহিক শ্রমকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলে চলিবে না। আত্মসম্মান সম্বন্ধে বিপর্য্যয়গ্রস্ত বুদ্ধি সর্ব্বথা বর্জ্জন করিতে হইবে। বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান যে সামাজিক কুপ্রথা, সাড়ে চারিশত জাতির যে বিষবৃক্ষ ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। আর বর্ত্তমান শিক্ষাধারার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। বিজ্ঞান প্রভৃতিকে উঠাইয়া দেওয়ার কথা বলিতেছি না। যাঁহাদের হৃদয় শুদ্ধ, অপরের দুঃখে যাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হয়, যাঁহারা প্রচুর মনীষাসম্পন্ন তাঁহারাই এ ব্যবস্থা করিবেন। দরিদ্রের জন্য যে সমস্ত ধনীর প্রাণ কাঁদে তাঁহারা যদি আধুনিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির জন্য বেশী অর্থব্যয় না করিয়া গ্রামে গ্রামে পুষ্করিণী খনন করাইয়া জলদান করেন আর উপযুক্ত মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য দরিদ্র জনকে সবৎসা গাভী দান করেন তাহা হইলে তাঁহারা দেশের অতুলনীয় হিতসাধন করিবেন।

জানি, যাঁহাদের হাতে অর্থ, যাঁহাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, উড়ো-জাহাজ, ডুবো-জাহাজ, যাঁহাদের হাতে উড়ো বোমা, বিষবাষ্প, যাঁহাদের হাতে যানবাহন, তার-বেতারের সরঞ্জাম, তাঁহাদের শক্তি হিমালয়ের মত উচ্চ। কিন্তু ইহাও জানি, উহা পাপমলিন অজ্ঞানের স্তূপ; পুণ্যজ্ঞানের বজ্রাঘাতে উহা এক মুহূর্ত্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। রুধিরলোলুপা মায়ার রুধিরতৃষ্ণা শীঘ্র দূর হইবে না, ছিন্নমস্তার পুনরভিনয় হয়ত সকলে শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন।

ভারতের বর্ত্তমান ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়

শ্রীসত্যরঞ্জন বিশ্বাস, এম. এ., এ আই. আই. বি.

গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতবর্ষে অন্যান্য বহু ব্যবসায়ের ন্যায় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়েরও বহুল প্রসার হইয়াছে। ৩৫।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও জনসাধারণের নিকট ব্যাঙ্ক বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই। তৎকালে ইহা সাধারণতঃ ধনী ব্যবসায়ী ও পুঁজিওয়ালাদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইত এবং সাধারণ ব্যক্তি ইহা হইতে দূরেই অবস্থান করিত। অবশ্য তৎকালীন ব্যাঙ্কসমূহের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী সাধারণলোকের উৎসাহ ও সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করে নাই, একথা সত্য। বস্তুতঃ তাহাদের ইহার প্রয়োজনও ছিল না, কারণ অধিকাংশ ব্যাঙ্কই বিদেশীর দ্বারা অধিকৃত ও পরিচালিত ছিল। কিন্তু বিগত ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে দেশীয় বহু ক্ষুদ্র ও নাতিবৃহৎ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। আজকাল সাধারণ ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের দৈনন্দিন আর্থিক ব্যাপারে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং এই ব্যাঙ্ক-কারবার-মনোবৃত্তি ক্রমশঃই সমাজের সর্ব্বস্তরে বিস্তার লাভ করিতেছে। উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব।

ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা দুইভাবে আলোচিত হইতে পারে—প্রথমতঃ, ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা গঠন-প্রণালী, আয়ু, আর্থিক অবস্থা ও দেশ-বিদেশে তাহাদের সম্মান ইত্যাদি বিচার করিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, এই বর্ত্তমান ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা আমাদের কৃষি, শিল্প

ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যক্তিগত জীবন ও রাষ্ট্রিক স্বার্থ প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রের সর্ব্ব-অবস্থার প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া

বর্ত্তমান ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কয়েকটি বিভিন্ন রূপ ও পর্য্যায় পরিদৃষ্ট হয়। এদেশীয় যাবতীয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানকে কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রথম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। বিশালতায় ও প্রাধান্যে ইহা সর্ব্বপ্রথম হইলেও ইহার আবির্ভাব সর্ব্বশেষে। ইহাই আমাদের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় তথা সমুদয় আর্থিক প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। বস্তুতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়াই সৃষ্ট। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে ইহা আমাদের মুদ্রানীতি, বিনিময়নীতি ও ব্যাঙ্কব্যবসায়ের নীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি কাগজী মুদ্রা (paper currency) বাহির করিবার ক্ষমতা একমাত্র ইহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তদুপরি ইহা গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের ব্যাঙ্ক। গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক অর্থ এই নয় যে, ইহা গবর্ণমেণ্টের অর্থে সৃষ্ট। পরন্তু ইহা একটি অংশীদারী প্রতিষ্ঠান। সাধারণের নিকট অংশ বিক্রয় করিয়া ইহার মূলধন সংগৃহীত। তবে ইহার পরিচালনা-নীতির উপর গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরেই ভারতীয় ব্যাঙ্ক জগতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের স্থান। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককেই বৈদেশিক পদ্ধতি অনুযায়ী স্থাপিত ভারতের প্রথম ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে। প্রথম অবস্থায় ইহার অন্য নাম ছিল; মাত্র গত ২৪ বৎসর যাবৎ ইহা বর্ত্তমান নামে পরিচিত হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সৃষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য্য করিত এবং বর্ত্তমানও ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্সী কার্য্য করিবার আইনানুমোদিত অধিকার পাইয়াছে।

এক সময় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পর্য্যায়ে উন্নীত করার প্রস্তাবও হইয়াছিল। কিন্তু ইহার অংশীদারগণের অধিকাংশই অ-ভারতীয় বলিয়া এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিম্নে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির (Exchange Banks) নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে টাকার যে লেনদেন ও আর্থিক চাহিদা হয় তাহা এই ব্যাঙ্কগুলি মিটাইয়া থাকে। বিনিময় কার্য্য ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও ইহাই তাহাদের একমাত্র কার্য্য নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সৃষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে ইহাদের কার্য্যকলাপের উপর কোনও রূপ হস্তক্ষেপ করা হইত না। অধুনা অনেকস্থলে বিনিময় ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে হইয়াছে। তথাপি ভারতীয় ব্যাঙ্কের বিনিময়-কার্য্য-প্রচেষ্টার ইহারা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহাদের অগাধ সম্পত্তি ও সংঘবদ্ধতা ইহাদিগকে একটি বিশেষ সুবিধা ও প্রাধান্যের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

শ্রেণী-বিভাগের চতুর্থ পর্য্যায়ে এতদ্দেশীয় যৌথকারবার-বিশিষ্ট ব্যাঙ্কসমূহের (Joint Stock Banks) স্থান। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি (Co-Operative Credit Societies) গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও তত্ত্বাবধানে পুষ্ট হইয়া ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের কতকটা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শ্রেণী-বিভাগানুযায়ী ইহাদিগকে পঞ্চম পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীতও এদেশে লোন অফিস, পোষ্ট-অফিস-চালিত সেভিংস বিভাগ, মহাজনী কারবার প্রভৃতি বহুপ্রকার প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। সেগুলি প্রকৃত ব্যাঙ্ক আখ্যা প্রাপ্ত না হইলেও অনেকাংশে ব্যাঙ্কের অনুরূপ কার্য্যেই রত আছে।

ভারতীয় ব্যাঙ্কের ইতিহাসে জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কগুলির (দেশীয় আধুনিক ব্যাঙ্কসমূহকে এই নামে অভিহিত করা হয়) অগ্রগতি

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩০-৩৭ সালে যে সমস্ত ব্যাঙ্কের মূলধন ও রিজার্ভ ৫ লক্ষ টাকার অধিক তাহাদের সংখ্যা ৩১ হইতে ৪২ হইয়াছে। আর যে সমস্ত ব্যাঙ্কের মূলধন ও রিজার্ভ ১ লক্ষের অধিক অথচ ৫ লক্ষের অনধিক তাহাদের সংখ্যা ৫৭ হইতে ৭৪-এ দাঁড়াইয়াছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্কসমূহের আমানতী টাকার পরিমাণ উক্ত সময়ে ৬৩ কোটী হইতে ৯৮ কোটীতে উঠিয়াছে। বড় বড় ব্যাঙ্কের এই উন্নতি সন্তোষজনক হইলেও যদি ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কের গড়পড়তা হিসাব ধরা যায়, তাহা হইলে এই উন্নতি ততটা প্রতীয়মান হয় না। নিম্নে এই দুই প্রকার ব্যাঙ্কের গড়পড়তা হিসাব দেওয়া হইল।

	১৯৩০	১৯৩১	'৩২	'৩৩	'৩৪	'৩৫	'৩৬	
মূলধন ও রিজার্ভ :—	১৩'৩	১৩'৪	১৩'৫	১৩'৭	১৪'২	১৪'৭	১৫'৫	কোটি টাকা
আমানত :—	৬৭'৭	৬৬'১	৭৬'৩	৭৬'৪	৮১'৯	৯০'	১০৩'৭	ঐ
মোট—	৮১'	৭৯'৫	৮৯'৮	৯০'১	৯৬'১	১০৪'৭	১১৯'২	ঐ

অবশ্য আমানতী টাকার যে ক্রমবৃদ্ধি আমরা এই তালিকা হইতে দেখিতে পাই তাহা একেবারে নৈরাশ্যজনক নহে। কিন্তু অন্যান্য সভ্য দেশের সহিত তুলনায় এই পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি লোকের ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ১২২৪৲ টাকা, ইংলণ্ডে জনপিছু ৮২৯৲ টাকা, কিন্তু ভারতবর্ষে জনপিছু আমানতের পরিমাণ ১০৲ টাকা মাত্র। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, উক্ত দুই দেশের তুলনায় আমাদের জাতীয় আয় প্রায় অনুরূপ নগণ্য।

ভারতের প্রথম ৫টি ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। ইহা হইতে আমাদের জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কসমূহের অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যাইবে।

ব্যাঙ্ক	মূলধন	রিজার্ভ	আমানতী টাকা ও মোট দায় টাকা
১। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া	১,৬৮,১৩,০০০	৯৮,০৫,০০০	৩৫,৯৬,৪৩,০০০
২। ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া	১,০০,০০,০০০	১,২৫,১৭,০০০	১৯,২৬,১৯,০০০
৩। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	৩৫,৫০,০০০	৫৭,১১,০০০	১১,৬৯,১৩,০০০
৪। পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক	৩১,৩৭,০০০	২২,৮১,০০০	৭,৪৪,৫১,০০০
৫। ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা	৩০,০০,০০০	২৭,৩৫,০০০	৭,৫৯,৩৬,০০০
			৮১,৯৫,৬২,০০০

প্রদত্ত তালিকার সর্ব্বশেষ অঙ্কটিই আমাদের আলোচনার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইহা হইতে আমরা এই দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশের প্রথম ৫টি ব্যাঙ্কের মিলিত সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৮২ কোটি টাকা। ইংলণ্ডের প্রথম পাঁচটি ব্যাঙ্কের ক্ষুদ্রতম ন্যাশান্যাল প্রভিন্সিয়েল ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা গত ১৯৩৭ সালে নিম্নরূপ।

মূলধন	৯,৪৭৯,০০০ পাউণ্ড
রিজার্ভ	৮,৫০০,০০০ „
আমানত ও মোট দায়	৩৪৮,৬২২,০০০ „

টাকার হিসাবে ধরিলে এই ব্যাঙ্কের সম্পত্তির পরিমাণ অন্যূন ৪৫০ কোটি টাকা। আমাদের দেশের প্রথম ৫টি ব্যাঙ্কের মিলিত

সম্পত্তির পরিমাণ ইংলণ্ডের প্রথম পাঁচটির ক্ষুদ্রতম ব্যাঙ্কের সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশেরও কম।

ব্যাঙ্কের জগতে আমাদের স্থান কোথায় তাহার মোটামুটি ধারণা ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়-কার্য্যে রত আছে এমন একটিও ভারতীয় ব্যাঙ্ক নাই। অথচ ইহা ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের যে সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক কারবার (যদিও সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনকও বটে) সে বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই একমত। এদেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের অর্থের স্বল্পতা ও অনভিজ্ঞতাই যে এজন্য প্রধানতঃ দায়ী, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টও সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নহে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সমালোচনা কালে একটা কথা আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই যে, আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসাক্ষেত্রে ব্যাঙ্কসমূহের যে সম্ভ্রম থাকা আবশ্যক তাহা আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের নাই। ইহা লজ্জার কথা বটে, কিন্তু ইহাই প্রকৃত ঘটনা। বিনিময় ব্যাঙ্ক-সমূহের সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি কেবলমাত্র অর্থের উপর নির্ভর করে না। আমাদের রাজনৈতিক পশ্চাদ্‌বর্ত্তিতার প্রতিক্রিয়া এদেশীয় ব্যাঙ্ক-সমূহের আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়-ব্যবসা-প্রচেষ্টা ব্যাহত করিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া বৈদেশিক বিনিময় কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা স্বরূপ লণ্ডনে একটি শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাহাকে সে ব্যবসা গুটাইতে হয়। ইহা অতীব দুঃখের, সন্দেহ নাই।

ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কসমূহের সম্পদের স্বল্পতা দেখাইয়াছি। ইহার জন্য আমাদের আর্থিক দুরবস্থা মূলতঃ দায়ী। অপর পক্ষে ব্যাঙ্কসমূহও একেবারে দোষমুক্ত নহে। তাহাদের কার্য্যপদ্ধতি ও গঠনপ্রণালী বহুলাংশে তাহাদের উন্নতি ও অগ্রগতিতে বাধা দান করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। ব্যাঙ্ক পরিচালনায় যে একটি

বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসৃত হয় এবং পরিচালনা কার্য্যের নিমিত্ত যে শিক্ষার প্রয়োজন ইহা প্রথমাবস্থায় দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতই ছিল —এমন অনুমতি হয়। বর্ত্তমানেও যে তাহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইয়াছে তাহা প্রতীয়মান হয় না। সেই হেতু আমাদের দেশে বহু ব্যাঙ্কই ফেল করে। অথচ অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে, ব্যাঙ্ক ফেলের কারণ অসাধুতা নহে—অজ্ঞতা। বহু ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইয়া তাহাদের সমস্ত দায় পুরাপুরিভাবে মিটাইতে সক্ষম হইয়াছে। এসব স্থলে সাধুতা ও বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য পরিচালিত হইলেও পরিচালনা-নীতিতে এমন কিছু গলদ ছিল যেজন্য একটা সামান্য আকস্মিক বিপদের ধাক্কা ঐ সব ব্যাঙ্ক সামলাইতে পারে নাই। ইদানীং ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা কিছু হ্রাস পাইলেও তাহার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে। ১৯৩১-৩৭ সালের মধ্যে ২৩৭টি ব্যাঙ্ককে কারবার গুটাইতে হয়। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের মূলধন মোটের উপর ১ কোটী ৩ লক্ষ টাকা। প্রদেশ হিসাবে দেখা যায়, পাঞ্জাবেই ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরে ক্রম হিসাবে যুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশ। বাংলাদেশের অসংখ্য লোন অফিস জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের পর্য্যায়ভুক্ত নহে।

এই সমস্ত ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি যে অতিশয় বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। অধিকন্তু আমাদের দেশের আধুনিক ব্যাঙ্কের সংখ্যাল্পতা লক্ষ্য করিলে এই দুরবস্থা আরও শোচনীয় ভাবে পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। ৪০ কোটী নরনারী-অধ্যুষিত এই ভূভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ২০০০এর বেশী আধুনিক ব্যাঙ্ক নাই। দেশীয় রাজ্য সমেত ভারতে ২৩১৬টি সহর ও প্রায় ৭ লক্ষ গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে মাত্র ৮০০টি স্থানে যুদ্ধের পূর্ব্বের হিসাব অনুসারে আধুনিক ব্যাঙ্ক আছে। কাজেই এখনও ভারতে

ব্যাঙ্ক প্রসারের কত বৃহৎ সুযোগ ও সুবিধা রহিয়াছে তাহা ইহা হইতে সহজেই অনুমেয়।

জয়েণ্ট্‌ ষ্টক্‌ ব্যাঙ্কগুলির পর এদেশীয় সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির (Co-Operative Credit Societies) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রকাশিত যুদ্ধের পূর্ব্বের ষ্ট্যাটুটারী রিপোর্ট হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৮২৫৩টী কৃষিসংক্রান্ত সমবায় ঋণদান সমিতি (Agricultural Co-Operative Credit Societies) আছে। তন্মধ্যে প্রায় একতৃতীয়াংশ চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত অর্থাৎ সেগুলি হয় ভালভাবে কাজ করিতেছে না, অথবা ব্যবসা প্রায় গুটাইবার উপক্রম করিতেছে। এই সমস্ত ঋণদান সমিতির সভ্যসংখ্যা ২৫৫২৬২৩ জন। এই সমস্ত সমিতির কার্য্যকরী মূলধন ৩০.৭৫.৪৪.৬৬১ টাকা। ইহার মধ্যে আদায়ীকৃত মূলধন ৩॥ কোটী ও রিজার্ভ ফণ্ড ৬॥ কোটী টাকা। ১৯৩৫-৩৬ সালে কো-অপারেটিভ্‌ ব্যাঙ্কগুলি মেম্বারগণকে ৫ কোটী টাকা ঋণ দিয়াছিল এবং অনুরূপ পরিমাণ অর্থ মেম্বারদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়াছিল। গ্রাম্য কো-অপারেটিভ্‌ ব্যাঙ্কের মূল উদ্দেশ্য কৃষক তথা কৃষির উন্নতি সাধন অর্থাৎ কৃষকেরা যাহাতে মহাজনদিগের নিকট হইতে অত্যধিক সুদে কর্জ্জ না লইয়া ব্যাঙ্কপ্রদত্ত অল্প সুদের ঋণের সুযোগ গ্রহণ করে। এই ব্যাঙ্কগুলির বাৎসরিক কর্জ্জদাদন মোটামুটি ৫ কোটী টাকা। কৃষি-কার্য্যের জন্য ভারতীয় কৃষকের ঋণ-চাহিদার ইহা একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান সমিতি (Central Banking Enquiry Committee) হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছেন, ভারতীয় কৃষকের মোট ঋণের পরিমাণ ১০০০ কোটী টাকা। তন্মধ্যে আমরা দেখি যে, মোটামুটি ২৫ কোটী টাকার জন্য তাহারা সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির নিকট

দায়ী। ইহা হইতেও ভারতের কৃষিঋণ চাহিদার যোগানক্ষেত্রে সমবায় ঋণদান সমিতিসমূহের অ-প্রাধান্যতা সূচিত হয়।

কিছু কাল পূর্ব্বে যে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কট দেখা গিয়াছিল তাহাতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। স্বভাবতই তাহার ধাক্কা সমবায় সমিতিগুলির উপর পতিত হয় এবং তাহাদিগকে বহু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হয়। এই ক্ষতির ফলে অনেক সমিতিকে লিকুইডেশানে যাইতে হয় এবং এই লিকুইডেশান-প্রাপ্ত সোসাইটীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। অবশিষ্ট সমিতিগুলি এই আঘাত সহ্য করিয়া লইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকটা জীবন্মৃত অবস্থায় পতিত হইয়াছে। তাহাদের সম্পত্তি সমস্তই আবদ্ধ এবং অনেকক্ষেত্রে হাতে মজুদ অর্থ দ্বারা দিনকার-দিন কিছু কাজ করিয়া নামেমাত্র বাঁচিয়া রহিয়াছে। কৃষকের আর্থিক দুরবস্থার দরুণ বহুদিন পূর্ব্বে কৃত ঋণসমূহও পরিশোধিত হয় নাই। মেম্বারগণ টাকা দিতে না পারায় প্রাথমিক সোসাইটীসমূহ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের গৃহীত কর্জ্জের টাকা দিতে পারে নাই এবং ঠিক উক্ত কারণে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহও প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই।

এক্ষেত্রে একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারে এবং তাহার ইহা করাও কর্ত্তব্য, যেহেতু ইহাই ভারতীয় ব্যাঙ্কের অভিভাবক ও উপদেষ্টা। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র কয়েকটী সর্ত্তে এই সাহায্য দিতে সম্মত। যেমন, সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে তাহাদের সমস্ত কার্য্যপ্রণালী এবং তাহাদের কর্জ্জদাদন ও লগ্নী-কারবারের নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ছাচে ঢালিতে হইবে। এই সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটী সার্কুলার যোগে সমবায় ঋণদান সমিতিসমূহের উন্নতি বিষয়ক কয়েকটী মন্তব্য

প্রকাশ করে। যে কোনও ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার জন্য আমানতকারীদের বিশ্বাসপূর্ণ নির্ভরতা একান্ত আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কগুলির বর্ত্তমান লগ্নীনীতি সমালোচনা করিয়া বলে যে, তাহাদের ভ্রান্ত নীতিই এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে আমানতী টাকার অর্দ্ধেকের অধিক কর্জ্জদান ও লগ্নী করা কর্ত্তব্য নহে, এবং অন্ততঃ ঐ অর্থের এক-দশমাংশ নগদ মজুদ রাখা প্রয়োজন। বাকী টাকা সহজে আদায়যোগ্য সিকিউরিটীতে লগ্নী করা আবশ্যক।

বর্ত্তমানে গ্রাম্য সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি কেবলমাত্র কৃষককে ঋণদানই করিয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে এই একটী মাত্র উদ্দেশ্যে নিযুক্ত না থাকিয়া সমবায় সমিতিগুলির কৃষকের অন্যান্য আর্থিক সমস্যারও সমাধানে রত হওয়া প্রয়োজন। অল্প সুদে ঋণপ্রাপ্তির অভাবই কৃষকের একমাত্র সমস্যা নহে। বর্ত্তমান সমবায় প্রচেষ্টা কেবলমাত্র এই একটী লক্ষ্যে নিয়োজিত হওয়ায় এই আন্দোলন বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে। ঋণ-সমস্যা ব্যতীতও কৃষককে প্রতিদিন আরও বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়—যথা কৃষিজাত পণ্যের উচিত মূল্যে সরবরাহ প্রভৃতি। সমবায় নীতি এ সমস্ত ক্ষেত্রেও নিয়োজিত না হইলে কৃষকের আর্থিক অবস্থার প্রকৃত উন্নতি সাধন অসম্ভব।

সমবায় ঋণদান সমিতিসমূহের পর আলোচনাযোগ্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তন্মধ্যে দেশীয় ব্যাঙ্কার, মহাজন, নিধি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের ঠিক তথ্য পাওয়া দুরূহ, যেহেতু ইহাদের সম্বন্ধে কোনও সংখ্যাতত্ত্ব এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তবে আমরা সকলেই ইহা জানি যে, ভারতে প্রায়ই এমন কোনও গ্রাম নাই যাহার নিজস্ব একদল মহাজন নাই। ভারতে কৃষকের ঋণ যোগান প্রধানতঃ ইহারাই করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত

দেশীয় ব্যাঙ্কার ও মাদ্রাজ প্রদেশের চেটী প্রভৃতি শিল্প-বাণিজ্যেও ঋণদান করিয়া থাকেন। ভারতের কৃষকের ঋণভার ১০০০ কোটী টাকা এবং ইহার প্রধান অংশ দেশীয় ব্যাঙ্কার ও মহাজন প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত। ইহা হইতেই আমরা এই শ্রেণীর প্রাধান্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারি। অবশ্য ভারতের লোকসংখ্যার দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে এই ঋণের পরিমাণ খুব বেশী নহে। কিন্তু এই ঋণ সম্বন্ধে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ এই ঋণের একটা মোটা অংশ কৃষকের কৃষির উন্নতি-কল্পে ব্যয়িত না হইয়া তাহার দৈনন্দিন সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিগত কয়েক বৎসরে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস-প্রাপ্তি হেতু এই ঋণের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। কৃষকের এই ঋণভার সমস্যা ক্রমশঃই এরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে যে, প্রতি প্রদেশেই মহাজনী আইন ও অনুরূপ আইন পাশ করাইয়া এই ভার হ্রাস করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কৃষকের ঋণ-সমস্যা লইয়া বহুদিন হইতে এদেশে আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা না আসায় সে আন্দোলন বিশেষ ফলবান্ হয় নাই। কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই আন্দোলনকে কার্য্যে রূপায়িত করা সম্ভব হইয়া উঠে। কৃষকপ্রজা ও জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত আইন-সভার সভ্যসমূহ তাহাদের নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর ইচ্ছানুযায়ী এই প্রকার আইন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক কারণের চাপে পড়িয়া কৃষিখাতক ঋণ সম্বন্ধীয় আইনসমূহের এ প্রকার রূপদান করিয়াছেন যে, আইন রচনা কালে সর্ব্বদিক্ বিবেচনা করিবার সুবিধা তাঁহারা পান নাই। ফলে ঐ সমস্ত আইনের কঠোরতায় মহাজন কর্ত্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ যেরূপ হ্রাস পাইতেছে অপর দিকে সেই শূন্য স্থান পূরণের নিমিত্ত কোনও ঋণদান

প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয় নাই। ইহাতে কৃষকদের ঋণ-প্রাপ্তি সংক্রান্ত যে একটী সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের একটা মোটামুটী আলোচনা করিয়াছি। ইহাদের বহুপ্রকার রূপ ও পর্য্যায় পরিদৃষ্ট হইলেও ইহারা আমাদের আর্থিক জগতের সকল প্রচেষ্টার প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয় নাই। প্রবন্ধে উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের মধ্যে কয়েকটী কোন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক ও সমবায় ঋণদান-সমিতিসমূহের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের ঋণের চাহিদা মিটাইয়া থাকে। বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি ভারতের আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসাক্ষেত্রে লেন-দেনের কারবার করিয়া থাকে। কো-অপারেটীভ্ ব্যাঙ্কসমূহ চাষীর অল্প মেয়াদী (short term) ঋণের প্রয়োজন মিটাইয়া কৃষির উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। ইহাতে সকলের অভাব পরিপূরণ হয় না। আমাদের দেশে যে দুইটী ক্ষেত্রে ঋণ-প্রাপ্তির অভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হয় তাহা হইতেছে শিল্প ও কৃষি। এদেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের গঠন ও কার্য্য-প্রণালী এরূপ বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে যাহাতে তাহাদের পক্ষে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান একরূপ অসম্ভব। অথচ শিল্প ও কৃষির স্থায়ী প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে হইলে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ একান্ত আবশ্যক। কতিপয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Bank) প্রতিষ্ঠা করিয়া গবর্ণমেণ্ট কৃষির ক্ষেত্রে এই অভাব দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাহা দ্বারা এই বিশাল সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধানও হয় নাই।

কেবল ইহাই একমাত্র অভিযোগ নহে। যে সমস্ত ব্যাঙ্ক, ঋণ-যোগান-দাতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাদের

পরস্পরের মধ্যে কোনও রূপ সহযোগিতা নাই। নিজেদের সংহতি-শক্তিরও একান্ত অভাব। এতদ্ব্যতীত ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠাতা ও -পরিচালকবর্গকে স্ব স্ব স্বার্থের গণ্ডী বাহিরে দেশের কল্যাণকর বৃহত্তর স্বার্থের দিকে প্রায়ই দৃষ্টিপাত করিতে দেখা যায় না। এজন্য এদেশে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা ও -পরিচালনা সম্বন্ধে একটী ব্যাপক আইনের একান্ত প্রয়োজন। ইন্‌সিওরেন্স আইনের অনুরূপ একটী ব্যাঙ্ক আইনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষজ্ঞ মহলে আলোচিত হইতেছে।

সান্ধ্য শিল্প-শিক্ষালয়

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী,

এম্. এ., পি-এইচ্. ডি., পি. আর. এস্.,

আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা দিবাভাগেই হইয়া থাকে। সন্ধ্যাবেলায় সব স্কুল-কলেজ বন্ধ। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, সন্ধ্যাবেলায় শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছুক এমন লোক বহু আছে। তাহারা দিবাভাগে জীবিকা অর্জ্জন করিবার জন্য সহরে সাধারণতঃ ফ্যাক্টরী-অফিসাদিতে কর্ম্ম করে, পল্লীগ্রামে কৃষিকার্য্য, গোচারণ প্রভৃতি করিয়া থাকে। ইহাদের কথা কেহ বড় একটা ভাবেন না। মধ্যে মধ্যে নাইট স্কুলের কথা পড়ি। দুই একটি নাইট স্কুল দেখিয়াছি। একটি স্কুলে দেখিয়াছি—ঝাড়ুদার, মেথর প্রভৃতি নিম্নজাতীয় লোকেদের ছেলেরা লেখাপড়া করিতেছে। বেশ শিখিতেছে। একটি পল্লীগ্রামের নাইট-স্কুলে নিতান্ত চাষাভুষা লোকের ছেলেদিগকে এমন কি যুবকদিগকে লেখাপড়া করিতে দেখিলাম। দিবাভাগে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছেলে ও যুবক গোচারণ করে বা মাঠে পিতাপিতৃব্যদিগকে তাহাদের কার্য্যে সহায়তা করে অথবা গরুর গাড়ী চালায়। তবে মনে রাখিতে হইবে এই যে, এই সব নাইট স্কুল চালাইবার ভার লইয়া থাকেন সরকার, ডিষ্ট্রীক্‌ট্‌ বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটি নহে। প্রধানতঃ কোন কোন স্বদেশ-বৎসল দরদী যুবককর্ম্মী এগুলি পরিচালনা করেন। অর্থাভাবে এগুলি বেশী দিন স্থায়ী হয় না। শিল্প-শিক্ষার আয়োজনও এ-সব স্কুলে বেশী থাকে না। যাহারা দিবাভাগে কর্ম্ম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে, তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষার

জন্য প্রায় কোনও ব্যবস্থাই আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে নাই। কিন্তু থাকা একান্তই উচিত।

তারপর উচ্চস্তরের শিক্ষার কথা ধরুন। হাইস্কুলের বাড়ীগুলি সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে। সেখানে সন্ধ্যাবেলায় আলো জ্বালাইয়া বয়স্ক লোকদের জন্য সাধারণ ও কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না কি? শিক্ষকের অভাব নাই। আমার বিশ্বাস, ছাত্রেরও অভাব হইবে না। কিন্তু করে কে? আমাদের মধ্যে যাঁহারা মাতব্বর তাঁহাদের এদিকে দৃষ্টি কোথায়? দিবাভাগে জীবিকা-উপার্জ্জনকারীর পক্ষে উচ্চতর শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ। এই রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিবার সময় আসিয়াছে।

আরও উচ্চস্তরের শিক্ষার কথা ধরি—কলেজী শিক্ষা। বৈকাল হইলেই কলেজের দ্বারে তালা পড়িল, ক্লাসরুম, লাইব্রেরী, লেবরেটরী সব বন্ধ। কেন, বলিতে পারেন? সন্ধ্যাবেলায় এই সব কলেজে পড়িয়া অনেক ছেলে ত মানুষ হইতে পারে। অনেকে আই.এ, বি.এ, আই. এস-সি, বি. এস্-সি, পাশ করিতে পারে। আমি অসার ও কাল্পনিক কথা বলিতেছি না। অনেকে হয়ত জানেন না যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আই. কম. ও বি. কম. পরীক্ষার্থী ছাত্রদের অধিকাংশই সান্ধ্য-ক্লাশেই পড়ে। দিনের বেলায় তাহারা ব্যাঙ্ক, অফিসাদিতে কর্ম্ম করে। অফিসের ছুটি হইলেই তাহারা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া দলে দলে, শতে শতে, কলিকাতার বড় বড় কলেজে আই. কম, বি. কম পড়িয়া পাশ করে এবং নিজেদের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু ফ্যাক্টরীতে যাহারা হাতে কাজ করে তাহারা সারাজীবন মিস্ত্রীই থাকিয়া যায়। তাহাদের সাধারণ ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কোনও ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। উন্নত শিল্প-দক্ষতা শুধু হাতের

কাজের উপরই নির্ভর করে না। বিজ্ঞানের জ্ঞানও সেজন্য প্রয়োজন হয়। সেইজন্য বলিতেছিলাম, ইহাদের শিক্ষার জন্য দেশের সমস্ত ল্যাবরেটরী সন্ধ্যায় খোলা থাকুক এবং ইহাদিগকে বিজ্ঞানপাঠের সুবিধা করিয়া দেওয়া হউক। যাহারা ম্যাট্রিকুলেশান পাশ নহে তাহাদিগকে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ও অল্প ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হউক। যাহারা ম্যাট্রিকুলেশান পাশ, তাহারা আই. এস্-সি. পড়ুক। তবে ঐ পরীক্ষায় প্রচলিত ইংরেজি ও বাঙ্গালার কঠিন পাঠ্য বিষয় বাদ দিয়া তাহাদিগকে স্বল্প ইংরেজি ও বাংলা পড়াইবার ব্যবস্থা হউক। এক কথায় ইহাদের জন্য নূতন ধরণের ম্যাট্রিক ও আই. এস্-সি. পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হউক।

আর এক শ্রেণীর ছাত্র আছে। তাহারা ম্যাট্রিক, আই. এস্-সি, এমন কি, বি. এস্-সি পাশ। দিনের বেলায় চাকরী করে। রাত্রে শিল্প শিক্ষা করিতে চায়। তাহাদের জন্য পলিটেকনিক খোলা হউক। এই সকল পলিটেকনিক দিবা ও সন্ধ্যায় খুলিয়া রাখিতে হইবে। এখানে বিজ্ঞান ও শিল্প দুইই শিখান হইবে। বিলাতে এরূপ বহু বড় পলিটেকনিক আছে। এগুলির পরিচালনার ভার বিলাতের 'কাউণ্টি কাউন্সিল' বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উপর আছে। লণ্ডনের কাউণ্টি কাউন্সিল এইরূপ অনেকগুলি পলিটেকনিক পরিচালনা করেন। এগুলি দিবা ও সন্ধ্যায় খোলা থাকে। বাস্তবিক সন্ধ্যার ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা দিবার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। ১৯৩৪—৩৫ সালে গ্রেট-ব্রিটেনে দিবা ও সন্ধ্যায় টেকনিক্যাল ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এইরূপ ছিল :—

	দিবা	সন্ধ্যা
পুরুষ—	২২,০০০	৪,৬৬,৭০০
মহিলা—	৭,৩০০	৪,২২,৭০০
মোট—	২৯,৩০০	৮,৮৯,৪০০

উপরোক্ত সংখ্যাতালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, দিবার ছাত্র-ছাত্রী অপেক্ষা সন্ধ্যার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশগুণ বেশী। অনেকে হয়ত এ সংবাদ মোটেই রাখেন না। ভারতবর্ষের অনেক যুবক এই সকল পলিটেক্‌নিক হইতে পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন ও কারখানা খুলিয়াছেন বা কৃতিত্বের সহিত সরকারী কার্য্য করিতেছেন। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ যে শিল্পে এত বড়, তাহার মূলে রহিয়াছে শিল্পশিক্ষা। শিক্ষাই জাতীর উন্নতির বাহন। সে শিক্ষা যে দিবাভাগেই দিতে হইবে এরূপ অন্ধ বিশ্বাস আজ পরিত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। বিলাতের বড় বড় কাউণ্টি কাউন্সিলের মত কলিকাতা বা অন্যান্য বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটিকে বহু পলিটেক্‌নিক খুলিতে হইবে—গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে অর্থ সাহায্য করুন বা নিজেই ব্যয় বহন করুন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতায় সন্ধ্যায় একটি কমার্সিয়াল কলেজ ও ছোট পলিটেক্‌নিক খুলিয়াছেন। দুইই খুব ভাল চলিতেছে। কিন্তু পলিটেক্‌নিক্‌টি অতি ছোট। উহাকে খুব বাড়ান দরকার। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় সহরের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে স্ব স্ব স্থানে পলিটেক্‌নিক্‌ খুলিতে হইবে। আই. এ, বি.এ, এম.এ, বি.এল এর সংখ্যা আর বাড়াইতে অনেকে চাহেন না, ছেলেরাও এই সব উপাধির মোহ অনেক পরিমাণ কাটাইয়া ফেলিয়াছে। বিজ্ঞান, কমার্স ও শিল্পের উপর ঝোঁক এখন সকলেরই—ছাত্রের ও অভিভাবকেরও। দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর সমস্ত দেশে এখন শিল্পোন্নতির জন্য সাড়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্রে পড়ি, আমেরিকায় মোটরের কারখানা হইতে তিন মিনিট অন্তর একখানা সম্পূর্ণ মোটর গাড়ী বাহির হইয়া আসিতেছে, তিন দিনে একটা সম্পূর্ণ জাহাজ নির্ম্মিত

হইতেছে, বৎসরে ষাট হাজার এরোপ্লেন প্রস্তুত হইতেছে। আর আমরা?

আমরা এখনও সরকার-মোহ ছাড়িতে পারি নাই। যন্ত্রশিল্পকে বরণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছি। সুখের বিষয়, বোম্বাইএর মিল-মালিকগণ এক হাজার কোটি টাকার শিল্প-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। টাটা কোম্পানী, বিরলা ব্রাদার্স, আলামোহন দাশ প্রভৃতি শিল্পনায়কগণ যন্ত্রশিল্পকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেশের সর্ব্বত্র অনুকরণযোগ্য। এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কারখানার জন্য শিক্ষিত কর্ম্মী প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে, কারখানাতে পলিটেকনিক্ স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান ও উচ্চাঙ্গের শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যালিটি, গভর্ণমেণ্ট ও মিলমালিকগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই সকল শিক্ষায়তনে শিক্ষাকার্য্য চলিবে—দিবা ও সন্ধ্যা উভয় সময়েই। তবেই সকল শ্রেণীর যুবক, কর্ম্মী ও কারিকর শিল্প-শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়া নিজেরা মানুষ হইবে এবং দেশে শিল্পসম্ভার উৎপাদনে সম্যক্ সহায়তা করিতে সমর্থ হইবে।

ভারতীয় কার্পাসবীজের বাণিজ্যিক ব্যবহার *

অধ্যাপক শ্রীবাণেশ্বর দাশ, বি. এস্., সি-এইচ. ই.
(ইলিনয়েস, ইউ. এস্. এ.)

তূলা প্রধানতঃ ভারতবর্ষ, মিশর ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে (ইউ. এস্. এ.) উৎপন্ন হয়। চীন, জাপান ও অন্যান্য কয়েকটী দেশেও অল্প পরিমাণে তূলার চাষ হয়।

বিভিন্ন দেশে তূলাচাষের ভূমির পরিমাণ (একর)

যুক্তরাষ্ট্র	ভারতবর্ষ	মিশর
১৯১৬ —৩,৫২,২৪,০০০	১,৭৭,৪৬,০০০	১৭,১৮,০০০
১৯১৭—৩,৩৮,২৭,০০০	২,১৭,৪৫,০০০	১৭,৪০,০০০
১৯১৮ —৩,৫৯,৯৮,০০০	২,৫২,৯৯,০০০	১৩,৭৫,০০০
১৯১৯ —৩,৩৫,৩৪,০০০	২,২৯,৯৯,০০০	১৬,৩৩,০০০

বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন তূলাবীজের পরিমাণ (টন)

যুক্তরাষ্ট্র	ভারতবর্ষ	মিশর
১৯২৩-২৪—৪০,৮৪,১০০	২১,৮১,৪০০	৬,০৭,১০০
১৯২৪-২৫—৫৪,৮৯,৪০০	২৫,৭৭,৪০০	৬,৭১,২০০
১৯২৫-২৬—৬৪,৮৭,৫০০	২৬,২৭,৫০০	৭,৩২,১০০
১৯২৬-২৭—৭২,৪৭,৫০০	২১,২৪,০০০	২,০৭,৫০০
১৯২৭ ২৮—৫২,২৪,৫০০	২৫,২১,০০০	৫,৬০,৭০০
১৯২৮-২৯—৫৮,৩৭,৭০০	২৪,৫৭,০০০	৭,৪১,২০০
১৯২৯-৩০—৫৯,৭৮,৩০০	২০,৯৬,০০০	৭,৮৩,৯০০
১৯৩০-৩১—৫৭,৪০,৭০০	২০,৪৪,৪০০	৭,৫৪,২০০

(* এই প্রবন্ধের অন্তর্গত সমস্ত হিসাব প্রাক্-যুদ্ধকালের।)

	চীন	রাশিয়া	পৃথিবী
১৯২৩-২৪—	১০,০০,০০০	৯৮,৯০০	৮৭,০০,০০০
১৯২৪-২৫—	১০,৯৮,৭০০	২,১৬,২০০	১,০৯,২০,০০০
১৯২৫-২৬—	১০,৬৭,০০০	৩,৯৫,৫০০	১,২২,৭৪,০০০
১৯২৬-২৭—	৮,৭৯,৫০০	৩,৭৮,৭০০	১,২২,৮৭,০০০
১৯২৭-২৮—	৯,৪৬,৮০০	৫,৮১,৬০০	১,০৫,৬৭,০০০
১৯২৮-২৯—	৯,৩১,৩০০	৫,৫১,৫০০	১,১৫,৩৯,০০০
১৯২৯-৩০—	৯,৫০,০০০	৫,৭৬,১০০	১,১৩,৬০,০০০
১৯৩০-৩১—		৯,০৩,৩০০	১,১৫,৯০,০০০

ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ও অন্যান্য দেশে কার্পাসবীজ রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য দেওয়া হইল।

	ব্রিটিশ সাম্রাজ্য		অন্যান্য দেশ	
	টন	টাকা	টন	টাকা
১৯২৫-২৬—	১,৯৩,৫৮০	২,১৪,৪২,৫৪৬৲	৩,৬১৩	৩,৬৮,৪০৫৲
১৯২৬-২৭—	৪৩,৫৩৩	৩৯,৭২,৩২৬৲	৭,০১৭	৫,৫৪,৬৩৯৲
১৯২৭-২৮—	১,৪৯,৯০০	১,৪২,০১,৫৪১৲	৩,০৫২	২,৬৮,৪৩৫৲
১৯২৮-২৯—	১,২০,৭৫৬	১,২৩,৩৭,২৩০৲	১০,৫৫৭	৯,২৩,০৪৭৲
১৯২৯-৩০—	৫৭,৭৫৮	৫৪,৮৪,৯০০৲	৬০	৫,৮৩৮৲

এই দেশে কত পরিমাণ তূলাবীজ উৎপন্ন হয় তাহা উপরে উদ্ধৃত হিসাব হইতে জানা যায়। ভারতের কার্পাসবীজের পরিমাণ সমগ্র তৈলবীজের প্রায় অর্দ্ধেক। আমেরিকায় এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তূলাবীজ উৎপন্ন হয়। আমেরিকার ঠিক পরেই ভারতবর্ষের স্থান। সমস্ত পৃথিবীর মোট তূলাবীজের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হয়।

তূলাবীজ নিষ্পেষণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকায় তূলাবীজ নিষ্পেষণের প্রথম চেষ্টা হয় এবং সেই সময় হইতে বরাবর এই শিল্প দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় মোট ৪,১০,০০০ টন (অর্থাৎ শতকরা দশ ভাগ) এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মোট ৪০,০০,০০০ টন (অর্থাৎ শতকরা আশী ভাগ) তূলাবীজের কাজ হয়। পরে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী ও ফ্রান্স এই শিল্প আরম্ভ করে। এই সকল দেশে ব্যবহৃত তূলাবীজ প্রধানতঃ মিশর ও চীন হইতে আমদানী হইত।

ভারতীয় কার্পাস-তৈল-শিল্পের ইতিহাস

কার্পাসবীজ-নিষ্পেষণ-শিল্প বহুদিন হইতে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রচলিত আছে, কিন্তু ভারতে ইহা সম্প্রতি প্রচলিত হইয়াছে এবং এখনও শিল্পের দিক্ দিয়া ইহা খুব বেশী উন্নত হয় নাই। প্রথম মেসার্স এ. এস্ জামাল এণ্ড ব্রাদার্স এই শিল্পে হস্তক্ষেপ করেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহারা ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদীর তীরে মিঙ্গান (Myingyan) নামক স্থানে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটী কারখানা আরম্ভ করেন। ঐ কারখানায় প্রত্যহ ৩০ টনের মত কাজ হইত। প্রতি টনে গড়ে প্রায় ৬৲ টাকা খরচ হইত এবং এই ব্যয় আমেরিকার অর্দ্ধেক। ১০০ পাউণ্ড বীজ হইতে ১৭ পাউণ্ড তৈল ও ৪৭॥ পাউণ্ড খইল (decorticated cake) পাওয়া যাইত। খোসাগুলি জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হইত, এবং খইল ভূমির সার, গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য জাপানে রপ্তানী হইত, পটাশ ও সোডালাই পরিশোধন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, সাবান ও লুব্রিকেটর (lubricator) প্রস্তুতি কার্য্যে তৈল ব্যবহার করা হইত এবং এইভাবে বৎসরে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আয় হইত।

এ দেশে বিস্তৃত তুলাবীজ-শিল্পের সম্ভাব্যতা নির্দ্দেশ করিয়া ভারত সরকারের বাণিজ্যিক সংবাদ বিভাগের ডিরেক্টর পরলোকগত নোয়েল প্যাটন (Noel Paton) কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ফলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্ত্তৃক কানপুরে একটী আদর্শ তুলাবীজ কল স্থাপিত হয়। সে সময় ব্যক্তিগত পরিচালনায় কয়েকটী অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। টাটা কোম্পানী বোম্বাই হইতে দশ মাইল দূরে কুরালা (Kurala) নামক স্থানে একটী কল স্থাপন করিয়া ভারতীয় তুলাবীজ হইতে পরিস্রুত তৈল ও খইল প্রস্তুত করেন। খইল ইংলণ্ডে রপ্তানী হইত এবং সেখানে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত; তৈল এদেশেই বিক্রীত হইত এবং তাহাতে বেশ দুই পয়সা লাভ হইত। প্রায় তিন বৎসর পরে আশানুরূপ লাভ না হওয়ায় কোম্পানী ঐ ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেন।

পরে বরোদা ও ব্রোচে (Broach) এক একটী কারখানা স্থাপিত হয়। এই কারখানাগুলি আধুনিক বিলাতী যন্ত্রপাতি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে মণ্ডিত ছিল। কার্পাসবীজ-শিল্পের পরিচালনা-কার্য্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে দুইটী কারখানার মধ্যে একটী একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, আর একটী কারখানা অন্যপ্রকার তৈলবীজ লইয়া কাজ আরম্ভ করে। কানপুরের সরকার-পরিচালিত আদর্শ কলটীও ভালভাবে পরিচালিত হইত না। উহা বন্ধ হইয়া শেষে নীলামে বিক্রীত হয়।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের কটন্ সীড্ অয়েল কোম্পানী বোম্বাইয়ের নিকটে একটি কারখানা স্থাপন করেন। ইহার উন্নতির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইহা অকস্মাৎ অজ্ঞাতকারণে বন্ধ হইয়া যায়। ঠিক ঐ সময়ে ইণ্ডিয়ান কটন্ অয়েল কোম্পানী অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করিয়া আহ্‌মেদাবাদের নাভসারীতে (Navsari)

একটি কারখানা স্থাপন করেন। প্রথমে ইহার দুই লক্ষ টাকা মূলধন ছিল এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ঐ মূলধন দশ লক্ষ টাকা হয়। ইহার মধ্যে মাত্র চারি লক্ষ টাকা ভারতীয়গণের। ইহাই সংক্ষেপে ভারতে কার্পাসবীজ-নিষ্পেষণ-শিল্পের ইতিহাস এবং ইহাতে অনেকগুলি কোম্পানীর অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া হতাশ হইতে হয়, কিন্তু কোন ব্যাপারই অকারণে ঘটে না। অকৃতকার্য্যতার কারণ-গুলি পরে আলোচিত হইতেছে।

তুলাবীজ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার

ভারতীয় তুলাবীজ নিষ্পেষণ করিলে তৈল শতকরা ১৫ ভাগ, খইল ৩৫.৬ ভাগ, খোসা ৪৮ ভাগ এবং লিণ্ট্ ১.৪ ভাগ পাওয়া যায়। কোন কোন জাতীয় ভারতীয় তুলাবীজে শতকরা ১৭ ভাগ তৈল ও ৪০ ভাগ খইল থাকে।

আমেরিকার তুলাবীজ হইতে ভারতীয় তুলাবীজ অপেক্ষা অধিক তৈল পাওয়া যায়, আর মিশরে উৎপন্ন তুলাবীজ পরিমাণে কম হইলেও উৎকর্ষের দিক্ দিয়া ভারতীয় বা আমেরিকার তুলাবীজ অপেক্ষা অনেক ভাল। মিশরের তুলাবীজে ২৫% পর্য্যন্ত তৈল পাওয়া যায়। ভারতীয় তুলার চাষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন, ভাল বীজ ব্যবহার ও জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ করিলে ভারতীয় তুলা ও তুলাবীজ উভয়েরই উৎকর্ষ বৃদ্ধি হইতে পারে। কার্পাসকোষ হইতে জিনিং মিলে (ginning mill) তুলা বাহির করা হয়, ফলে তুলাবীজ তুলা হইতে পৃথক হইয়া যায়। তুলা বাহির করিলেই তুলাবীজ সঙ্গে সঙ্গে একই স্থানে আনুষঙ্গিক দ্রব্য (by-product) হিসাবে পাওয়া যায়। কাজেই অন্যান্য বীজ সংগ্রহের ন্যায় তুলাবীজ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়

করিতে হয় না। বরং কার্পাস তৈল তৈয়ারীর জন্য আবশ্যক তূলাবীজ সংগ্রহ সহজ হইয়া যায়।

(ক) কাপাস তৈল

কার্পাস তৈলের স্থায়িত্ব-গুণ আছে এবং ইহাতে ষ্টিয়েরিন (stearine) নামক একপ্রকার পদার্থ থাকে। ঘৃতের ব্যবহার ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত হইতেছে। ঘৃতের মূল্য বর্দ্ধিত হওয়ায় গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকেরা ইহা কিনিতে পারে না। হিসাব করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক ভারতবাসী গড়ে যে পরিমাণ ঘৃত ব্যবহার করে তাহার পরিমাণ অতি সামান্য, কিছুই নয় বলিলেই চলে। যদি ১০০ মণ পরিস্রুত কার্পাস তৈলের সহিত ৩৫ মণ বিশুদ্ধ মাখন মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে মিশ্রিত মাখনের গন্ধ, বর্ণ বা স্বাদের বিকৃতি ঘটে না এবং সেই মিশ্রিত পদার্থ মাখন বা ঘৃতের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এখন দেখা যাইতেছে, ৩৫ মণ বিশুদ্ধ মাখনকে উত্তম কার্পাস তৈলের সাহায্যে ১৩৫ মণ উত্তম কৃত্রিম মাখনে পরিণত করা হয়।

কার্পাস-তৈল-শিল্পের সহিত ঘৃত-মাখন-প্রস্তুতি-ব্যবসায়ের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, ইহা নোয়েল প্যাটন সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তূলাবীজের খইল ঘৃত-মাখন-প্রস্তুতির-ব্যবসায়ে বিশেষ কাজে লাগে, কারণ উহা গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইল গবাদির দুগ্ধ নিশ্চিতই বৃদ্ধি হইবে। ঘৃতের পরিবর্ত্তে পরিস্রুত কার্পাস তৈল ব্যবহার করিতে গেলে তাহাতে মাখন মিশ্রিত করা দরকার, ফলে এদিক্ দিয়াও দুগ্ধ, সর প্রভৃতির চাহিদা বৃদ্ধি হইবে। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ঘৃতের পরিবর্ত্তে অনুরূপ উদ্ভিজ্জাত বস্তু ব্যবহার করা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে।

ভারতে কার্পাসতৈল-শিল্পের প্রসারের সুযোগ কতখানি এবং ব্যবসায়ীরা এই শিল্প হস্তগত করিবার জন্য কিভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা আমেরিকার জনৈক তৈল-বিশেষজ্ঞ মিঃ কন্‌সাল বেকারের (Mr. Consul Baker) ২০ বৎসর আগেকার নিম্নোদ্ধৃত বিবৃতি হইতে জানিতে পারা যায়।

"ভারতবর্ষে ঘৃতের পরিবর্ত্তে সস্তা ও সন্তোষজনক পদার্থ ব্যবহারের ক্রমবর্দ্ধমান আবশ্যকতা ও উহার অভাব রহিয়াছে। কার্পাস তৈলের মার্কিণ প্রস্তুতকারকগণের এবিষয়ে উপযুক্ত মনোযোগ দেওয়া এবং ভারতে ইহার ব্যবসায়ের সুখ-সুবিধা অন্বেষণের জন্য বিশেষজ্ঞ পাঠাইবার ইহাই উপযুক্ত সময়। ভারতে কার্পাস বীজ বহু পরিমাণে গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, ইহা সত্ত্বেও ভারত হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে তুলাবীজ ইউরোপে রপ্তানী হয়—কাজেই ভারতে কার্পাসতৈল আমদানীর সম্ভাবনা আছে ইহা অবিশ্বাস্য হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে বহুকাল এই দেশ ঘৃতের পরিবর্ত্তে এই দেশীয় কার্পাস বীজ হইতে সস্তা ও সন্তোষজনক পদার্থ বহু পরিমাণে উৎপাদনের নিপুণতা ও যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে কিনা সন্দেহ।"

সংস্কারান্ধ ব্যক্তিরা মনে করে যে, তুলাবীজ তৈল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এই সংস্কার দূর হওয়া প্রয়োজন। পরিস্রুত কার্পাসতৈল যে কোনও খাদনীয় চর্ব্বি অপেক্ষা অধিকতর উত্তম না হইলেও অন্ততঃ সমান কার্য্যকর ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ডঃ সি. গড্‌মার্ক, ডি. ডি. এস্., এম্. ডি. লিখিয়াছেন—ইহা নির্দ্ধারিত সত্য যে, উচ্চশ্রেণীর কার্পাস তৈল যে কেবল চর্ব্বিজাতীয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং ইহা দ্বারা কেক, বিস্কুট প্রভৃতি তৈয়ারীর কাজে সহায়তা হইতে পারে তাহা নহে। ইহার বহুবিজ্ঞাপিত কড্‌লিভার অয়েলের কতকগুলি গুণ আছে এবং ইহা

রুগ্ন শরীরে ঐ কড্‌লিভার অয়েলের ন্যায় উপকার দান করে। ইহা সেবনে পরিপাক-যন্ত্রের কোনও ক্ষতি হয় না।

আমেরিকার আরকানসাস (Arkansas) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোর (More) অনেক পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে, কার্পাস তৈল যে কোনও উদ্ভিজ্জ তৈল অপেক্ষা সহজপাচ্য। তাঁহার পরীক্ষার ফল এইরূপ—কার্পাস তৈলের সহজপাচ্যতা শতকরা ৯৩'৩৭, জলপাই তৈলের (olive oil) ৮৮'৮১ ভুট্টার তৈলের (corn oil) ৮৬'৪৭, বাদাম তৈল (peanut oil) ৮৫'৯৭।

আমেরিকার য়্যান্টি-টিউবারকিউলসিস্‌ লীগের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ জর্জ্জ ব্রাউন (Dr. George Brown) কার্পাস তৈল সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ছেলেদিগকে এই তৈল খাইতে দাও, তাহাদের গায়ে মাংস বৃদ্ধি হইবে এবং তাহারা ক্ষয় ও গলগণ্ড রোগ হইতে মুক্ত থাকিবে।"

বিশেষজ্ঞগণের এই সব বিবৃতি হইতে পাঠকগণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, কার্পাস তৈল হিতকর, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এক ইউনিট তৈল সমপরিমাণ কার্পাস বীজ অপেক্ষা আড়াই গুণ উত্তাপ দান করে।

খাদ্যরূপে ব্যবহার ছাড়া উচ্চাঙ্গের সাবান-প্রস্তুতি কার্য্যেও কার্পাস তৈলের ব্যবহার আছে। কার্পাস তৈল সাবান-প্রস্তুতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী হওয়ায়, ইহা সাবান-প্রস্তুতি-শিল্পে অনেক কাজে লাগে। অন্যান্য অনেক উদ্ভিজ্জ তৈল অপেক্ষা ইহার অধিক পরিষ্করণ-গুণ আছে। বস্তুতঃ, অনেক বিদেশী সাবান-কারখানা এই তৈল ব্যবহার করিতেছে। কার্পাস তৈল হইতে প্রস্তুত বহু-প্রকার সাবান (hard, soft, toilet, medicated etc.) বিদেশ হইতে ভারতের বাজারে আমদানী হয়। কাজেই এদেশে

কার্পাসতৈল-শিল্প শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিলে, সাবান-শিল্পও সমৃদ্ধ হইবে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আশা করিতেন, এমন একদিন আসিবে যেদিন ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে সাবান আমদানী করার পরিবর্ত্তে বিদেশে সাবান রপ্তানী করিবে। যেদিন উৎসাহী ভারতীয় অর্থবান ব্যক্তিগণ কার্পাসতৈল-শিল্পের সমুন্নতি ব্যাপারে মনোনিবেশ করিবেন সেদিন এই স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইবে।

কার্পাস তৈল লুব্রিকেটররূপে (lubricator) ব্যবহৃত হয়। লুব্রিকেটর ভারতের রেলওয়েগুলিতে প্রচুর পরিমাণে লাগে। অপরিষ্কৃত কার্পাস তৈল হইতে প্রস্তুত লুব্রিকেটর রেড়ীর তৈল বা প্রাণীজ চর্ব্বির সহিত মিশাইয়া গলান হয়। বহুকাল পূর্ব্বে অপরিষ্কৃত কার্পাস তৈল আলো জ্বালার কাজে লাগিত। (বিদেশে ব্যবহৃত) শূকর চর্ব্বির তুলনায় ইহা অধিকতর উজ্জ্বলভাবে দীর্ঘতর সময় জ্বলে। এই তৈল উড়িয়া যায় না, এবং সহজদাহ্য নহে, কাজেই ইহা কেরোসিন তৈল অপেক্ষা অধিক নিরাপদ।

কার্পাস তৈল ক্রুড অয়েল (crude oil)-এর পরিবর্ত্তে তরল জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। পেট্রোলিয়াম (petroleum) হইতে যে তরল জ্বালানী পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ এদেশে দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। সেইজন্য তরল তৈল পাওয়ার নূতন উপায় স্থিরীকরণের জন্য গবেষণা চলিতেছে। এদিক্ দিয়া উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ তৈল বিশেষ কাজে লাগিবে আশা করা যায়, কারণ এগুলি এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন পরীক্ষাগারে পরীক্ষার পর মোটের উপর সন্তোষজনক ফল হইয়াছে। অনেক দেশে এই উদ্দেশ্যে অল্প-বিস্তর উদ্ভিজ্জ চর্ব্বি ব্যবহৃত হয়। ভারতের পেট্রোলিয়াম সম্পদ্ অতি অল্প। ভারতে পেট্রোলিয়াম হইতে যে তরল জ্বালানী পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ মাত্র ৪॥ কোটি

গ্যালন, কিন্তু ভারতের ব্যয়ের জন্য প্রতিবৎসর দরকার হয় ৫৫ কোটি গ্যালন। কাজেই ভারতের উৎপন্ন তরল ইন্ধন তাহার ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৮ ভাগ। ব্যয়ের বাকী অংশ তাহাকে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ফলে ভারতের বহু কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। কাজেই অন্য উপায়ে তরল ইন্ধন পাওয়ার জন্য এদেশে চেষ্টা হওয়া উচিত। গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, আমাদের দেশের রেড়ী, সিমূল, মহুয়া, পালং, করঞ্জা, তিল, সরিষা, নারিকেল, চিনাবাদাম, কার্পাস প্রভৃতির তৈল ক্রুড্ অয়েলের পরিবর্ত্তে জ্বালানী তৈলরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কার্পাস তৈলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল দান করে। ইহাতে ক্রুড্ অয়েলের প্রায় সমান কাজ হয়। আমাদের দেশে এই তৈলের পরিমাণ সব চেয়ে বেশী।

বড় বড় সহর হইতে দূরবর্ত্তী মফঃস্বল অঞ্চলে ক্রুড্ অয়েলের দাম খুব বেশী, কিন্তু কার্পাস তৈল বা অন্যান্য উদ্ভিজ্জ চর্ব্বির দাম কম। কাজেই সে সব স্থানে উদ্ভিজ্জ চর্ব্বি তরল ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইলে অর্থনৈতিক লাভ হইবে।

(খ) খোসা

নিষ্পেষণের পূর্ব্বে বীজ হইতে প্রথমতঃ লিণ্ট (lint) অর্থাৎ বীজের গায়ে জড়ান অল্প তুলা বাহির করিয়া লওয়া হয়, পরে বীজ হইতে খোসা ছাড়ান হয়। খোসা গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। গাভী কার্পাস বীজের খোসা খাইলে তাহার বাঁট হইতে সহজভাবে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে পারে। বীজের মধ্যে গবাদির যে পরিমাণ পুষ্টি থাকে খোসায় তাহার শতকরা ২২ ভাগ থাকে। আমেরিকায় দুর্ভিক্ষের সময় গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহারের পক্ষে

কার্পাসবীজের খোসা খুব কাজে লাগিয়াছিল। ইহাতে পটাস্ ও ফস্ফরিক য়্যাসিড্ আছে। যদি ভারতে উৎপন্ন কার্পাসবীজের পরিমাণ কুড়ি লক্ষ টন বলিয়া ধরা হয়, তবে খোসার পরিমাণ হইবে প্রায় দশ লক্ষ টন। কার্পাসবীজের খোসা গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে, গোময় তুলাক্ষেত্রের উত্তম সার হইবে। এই সম্পর্কে অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। একবার ১৪৫ পাউণ্ড কার্পাস খইল ৫২০ পাউণ্ড কার্পাস খোসার সহিত মিশাইয়া এক খণ্ড জমিতে সার দেওয়া হয়, ফলে প্রতি একর জমিতে গড়ে ২৬০ পাউণ্ড কার্পাস বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল। সম পরিমাণ কার্পাস খইল ও খোসা গরুকে খাওয়াইয়া তাহার গোময় হইতে যে সার পাওয়া গিয়াছিল তাহার পরিমাণ হইয়াছিল ২৭১৯ পাউণ্ড এবং এই সার কার্পাস জমিতে প্রয়োগ করায় কার্পাসবীজের পরিমাণ প্রতি একরে গড়ে ৪২৭ পাউণ্ড হইয়াছিল। খোসায় শতকরা ·৬৯ নাইট্রোজেন ·২৫ ফস্ফরিক য়্যাসিড ও ১·০২ পটাস্ আছে।

(গ) খইল

কার্পাসবীজের শাঁস পেষণ করিয়া তৈল নিষ্কাশনের পর যে খইল পাওয়া যায় তাহা গবাদির পক্ষে অতি উত্তম খাদ্য। খাদ্য হিসাবে মূল বীজ অপেক্ষা খইলই অধিক উপযোগী। কারণ গবাদির পক্ষে খাদ্য-উপাদানগুলি বীজ অপেক্ষা খইলে উপযুক্ত অনুপাতে সন্নিবিষ্ট থাকে। খইলে কম তৈল থাকে এবং অধিক তৈল গবাদির পক্ষে অনিষ্টকর। ইহা উত্তম সারও বটে। ইহাতে শতকরা ৬·৭১ নাইট্রোজেন, ২·৮৮ ফস্ফরিক য়্যাসিড ও ১·৭৭ পটাস্ আছে।

(ঘ) লিণ্ট্

কার্পাস হইতে খোসা ছাড়াইবার পূর্ব্বে লিণ্ট্ বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই লিণ্ট্ প্রধানতঃ তোষক, উত্তম কাগজ ও অতি

সাধারণ সূত্র তৈয়ারী কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পাইরোক্সিলিন, ভার্ণিস, সেলুলয়েড, কৃত্রিম রেশম, কৃত্রিম চামড়া, ফিল্ম প্রভৃতি প্রস্তুতির ব্যাপারেও ইহা কাজে লাগে।

কার্পাস-বীজের অভিনব ব্যবহার

"হাইডেলবার্গের রসায়নবিদ্ পণ্ডিত Casper Schmidt কয়েক বৎসর গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে, তুলাবীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের পর যে প্রচুর পরিমাণ বাজে পদার্থ (খইল) পড়িয়া থাকে তাহাতে মানবশরীরের পক্ষে অতুলনীয় পুষ্টিকর জিনিষ থাকে। তিনি একটা প্রণালী বাহির করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ঐ জিনিষ এমন একটা জিনিষে পরিণত করা যায়, যাহা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সহিত সহজে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং তাহাতে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। ঐ জিনিষের অর্দ্ধেকের বেশী বিশুদ্ধ য়্যালবুমেন (albumen) এবং উহা শরীরগঠনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। বাকী অংশে অনেক পরিমাণে ফস্ফরিক য়্যাসিড্ ও য়্যালুমিনিয়াম সল্ট থাকে। ঐ জিনিষে এ, বি, সি, ই ভিটামিন অর্থাৎ খাদ্যপ্রাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে লেবু, কলা, খেজুর প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় ফল অপেক্ষা অধিক ভিটামিন আছে। মানুষের শরীরগঠন, মানসিক-শক্তিবর্দ্ধন, পরিপাক-শক্তি-বৃদ্ধি ও সাধারণ শারীরিক অবস্থার পুষ্টিসাধন পক্ষে ভিটামিনের আবশ্যকতা অনেক দিন হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে। তৈলনিষ্কাশনের পর খইল গবাদিকে খাওয়ান হইত অথবা এক প্রকার ফেলিয়া দেওয়া হইত। উহার দাম অতি সামান্য, কাজেই উহা ব্যবহার করা সকলের পক্ষেই সহজ। গত যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রে পাঁউরুটী তৈয়ারী করার জন্য গম ও ভুট্টার ময়দার পরিবর্ত্তে তুলাবীজচূর্ণ ব্যবহারের চেষ্টা হইয়াছিল। কার্পাসবীজের হরিদ্রাভ চূর্ণের এমন একটা গুণ আছে

যে, ইহা ময়দার তালের সহিত মিশ্রিত করিলে উহার রং কতকটা কাল হয়। মিশরে তুলাবীজচূর্ণ কফি ও কোকোর সহিত ব্যবহৃত হয়। কার্পাসবীজের য়্যালবুমেন স্বাদহীন ও বর্ণহীন বলিয়া কফি ও কোকোর গন্ধ ও বর্ণের বিকৃতি হয় না, বরং তাহাদের স্বাস্থ্যপ্রদ গুণ বাড়ে।"

তৈলনিষ্কাশনের আধুনিক প্রণালী

আজকাল পাশ্চাত্য দেশে কয়েকপ্রকার উন্নতধরণের বীজপেষণ যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তৈলনিষ্কাশন করিলে অতি অল্প তৈলই নষ্ট হয়। তৈলনিষ্কাশনের প্রাচীন প্রণালী অপেক্ষা আধুনিক প্রণালীই নিঃসন্দেহে উত্তম ও অল্পব্যয়সাপেক্ষ। তৈলনিষ্কাশনের দুইটী প্রধান প্রণালী আছে—(১) এক্স্‌প্রেশান (expression) (২) এক্স্‌ট্রাক্‌শান (extraction)।

প্রথম প্রকার প্রণালীতে প্রধানতঃ হাইড্রলিক প্রেস (hydraulic press) ও বিভিন্ন রকমের এক্সপেলার (expeller) ব্যবহৃত হয়। এই প্রণালী সর্ব্ব রকম তৈলবীজের পক্ষে উত্তম। কিন্তু কার্পাস বীজের ক্ষেত্রে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন দরকার হয়। কারণ কার্পাস-বীজ হইতে তৈলনিষ্কাশনের পূর্ব্বে বীজ হইতে লিণ্ট্‌ ও খোসা ছাড়াইয়া লওয়া হয়। সেজন্য কার্পাসবীজের তৈলনিষ্কাশনে হাইড্রলিক প্রেস ও এক্সপেলার ব্যতীত লিণ্ট্‌ ও খোশা ছাড়াইবার জন্য দুই প্রকার যন্ত্র আবশ্যক।

কার্পাসবীজ-সংরক্ষণ

কার্পাসবীজ সংরক্ষণে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। নতুবা বীজ নষ্ট এবং তৈলও নিকৃষ্ট হইতে পারে।

বীজভাণ্ডার শুষ্ক, পরিচ্ছন্ন ও বাতাসযুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং তাহাতে বীজ একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়ার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও থাকা দরকার। শৈত্য বীজ-সংরক্ষণের অন্তরায়, কারণ ইহাতে বীজ নরম হইয়া শাঁস পচিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

কার্পাসবীজ-পরিষ্করণ

কার্পাসবীজ-পরিষ্করণ অতিশয় আবশ্যক। ইহাতে তৈলের পরিমাণ ঠিক থাকে। কারণ বীজে ময়লা থাকিলে ময়লাতে যে তৈল শুষিয়া লইতে পারে, বীজ পরিষ্কার করিলে তাহার সম্ভাবনা থাকে না। আর অনেক ক্ষয়ক্ষতিও বাঁচিয়া যায়। বীজ-পরিষ্করণ যন্ত্র আজকাল এদেশে আমদানী হইয়াছে। ফলে রপ্তানী বীজের উৎকর্ষ প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়াছে। ভারতের আধুনিক কারখানাগুলিতে পরিষ্করণ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

বীজ হইতে লিণ্ট ছাড়ান

কার্পাসবীজ পরিষ্কার করার পর তাহা হইতে কলে লিণ্ট ছাড়ান হয়। লিণ্ট পরে নিকৃষ্ট তূলারূপে বিক্রয় হয়। বীজ হইতে লিণ্ট ছাড়াইবার পূর্ব্বে সেগুলি হইতে বাজে জিনিষ বাছিয়া ফেলা আবশ্যক, কারণ বাজে জিনিষ থাকিলে লিণ্ট ছাড়াইবার করাত (linter saw) নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই করাতের দাঁতগুলি ধারাল থাকা আবশ্যক। করাত ধারাল থাকিলেই যে, বীজের খোসা ছাড়িয়া যাইবে তাহা নহে। লিণ্ট ছাড়াইবার কল সব সময়ে ভাল অবস্থায় থাকা দরকার, এবং করাত ও ব্রাস উপযুক্ত বেগে চালান আবশ্যক।

বীজ হইতে খোসা ছাড়ান

কার্পাসবীজের খোসা অন্যান্য বীজের খোসা অপেক্ষা শক্ত। সেইজন্য ইহা ছাড়াইতে বিভিন্ন রকম যন্ত্রের আবশ্যকতা আছে। খোসা ছাড়াইবার যন্ত্র (decorticating machine) আজকাল সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে।

রোল গ্রাইণ্ডিং

বীজ হইতে খোসা ছাড়ান হইলে, শাঁসগুলিকে রোলারের সাহায্যে পেষণ করা হয়: ইহাতে তৈলকোষগুলি ভাঙ্গিয়া যায় এবং হাইড্রলিক প্রেস বা এক্স্‌পেলারে পেষণের উপযুক্ত হয়।

বীজ সিদ্ধ করা

কার্পাসবীজ হইতে খোসা ছাড়াইবার পর শাঁসগুলি প্রায় আধ ঘণ্টা উত্তপ্ত বাষ্পে সিদ্ধ করা হয়। ইহাতে শাঁস হইতে রস দূর হইয়া যায় এবং শাঁসগুলি কাদার মত নরম হয়, য়্যালবুমেন জমাট বাঁধিয়া যায়। বীজ সিদ্ধ করা সূক্ষ্ম ব্যাপার। অল্প সিদ্ধ বা অধিক সিদ্ধ ভাল নয়। বীজ উপযুক্তভাবে সিদ্ধ না হইলে তৈলের পরিমাণ কমিয়া যায়। শাঁসে অতিরিক্ত রস থাকিয়া গেলে খইল শক্ত ও কাল হয়। শাঁস অতিরিক্ত সিদ্ধ হইলে তৈলকোষগুলি শক্ত হয় আর তৈলের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং খইল কাল বা বাদামী রংএর হয়। অনেক সময় তৈলে পোড়া গন্ধ থাকে। অভিজ্ঞতা দ্বারা সিদ্ধ করিবার সময় নিরূপণ করিতে হয়, তবে সাধারণতঃ ২০ হইতে ৪০ মিনিট সিদ্ধ করিলে চলে। সিদ্ধ করার পর শাঁস অন্যান্য তৈলবীজের ন্যায় পেষণ করা হয়।

বীজনিষ্পেশনে এক্‌স্‌ট্রাক্‌শান (Extraction) প্রণালী

এই দ্বিতীয় প্রণালীতে বেঞ্জিন (benzine), পেট্রোল (petrol) প্রভৃতি দ্রাবক পদার্থের সাহায্যে বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন করা হয়। বীজ সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করা হইলে এই প্রণালী কাজে লাগে। ইহাতে তৈল ও দ্রাবক পদার্থ একসঙ্গে মিশিয়া যায়, পরে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে তৈল বাহির করা হয়। সাধারণতঃ এই প্রণালী কার্পাস বীজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কারণ, ইহাতে বীজের খোসা ও য়্যালবুমেন গলিয়া যায়। ফলে তৈল কাল ও চট্‌চটে হয়। কাজেই এই প্রণালী অবলম্বনের পূর্ব্বে খোসা ছাড়াইয়া লইলে আর কোন অসুবিধা থাকে না। কিন্তু খোসা ছাড়াইয়া লইলেও বীজে যে য়্যালবুমেন থাকে তাহা জমাট বাঁধিয়া যায়, ফলে তৈল নিষ্কাশনে অসুবিধা ঘটে। কাজেই বীজ সিদ্ধ না করিয়া নিষ্পেষণ দ্বারা বেশীর ভাগ তৈল বাহির করিয়া লওয়া উচিত এবং পরে খইল হইতে এই দ্বিতীয় প্রণালীতে পুনরায় তৈল বাহির করা দরকার। এই উপায়ে যে তৈল পাওয়া যাইবে তাহা নিকৃষ্ট হইবে এবং সাবান-প্রস্তুতি ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যে লাগিবে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে পেষণে (cold pressing) যে তৈল পাওয়া গিয়াছিল তাহা উৎকৃষ্ট এবং মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায়, আর খইল সার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। কাজেই উভয় প্রকার প্রণালীর (expression and extraction processes) সংমিশ্রণে উত্তম ফল পাওয়া যাইবে।

কার্পাসতৈলের পরিশোধন

যে কোন প্রণালীতেই তৈল নিষ্কাশন করা হউক না কেন, তৈল বাদামী রঙের হয় এবং এই কারণে ইহা মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহার হয় না। হাড্রোলিসিস প্রক্রিয়া দ্বারা ইহা হইতে চর্ব্বিময়

য়্যাসিড (fatty acid) ও গ্লিসারিন (glycerine) পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ইহাতে য়্যালবুমেন (albumen), মিউসিলেজ (mucilage), রংয়ের উপাদান, কিছু পরিমাণ উত্তম য়্যাল্‌ডিহাইড (aldehyde) ও কেটন (ketone) প্রভৃতি থাকে। সুতরাং খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে গেলে আগে ইহার পরিশোধন আবশ্যক। কোন বিশেষ শিল্পে ব্যবহার করিতে গেলেও কার্পাসতৈল পরিশোধন করা দরকার।

মেকানিক্যাল (mechanical) ও কেমিক্যাল (chemical) দুই উপায়ে তৈল শোধন করা যায়। প্রথম উপায়ে তৈল হইতে য়্যাল-বুমেন ও অন্যান্য ময়লা দূর হইয়া যায় এবং পরিষ্কৃত তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল সাধারণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে চলে। তৈলে চর্ব্বিময় য়্যাসিড্ থাকিলে তৈল বেশীদিন ভাল থাকে না। কিন্তু এই উপায়ে তৈল শোধন করিলে তৈলে চর্ব্বিময় য়্যাসিড থাকিয়া যায়।

দ্বিতীয় উপায়ে তৈল শোধনের তিনটি স্তর আছে—প্রথম, চর্ব্বিময় য়্যাসিড্ দূরীকরণ; দ্বিতীয়, তৈলের বর্ণ দূরীকরণ; তৃতীয় গন্ধ দূরীকরণ। খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে গেলে তৈলের গন্ধ দূর করা আবশ্যক।

চর্ব্বিময় য়্যাসিড্ দূরীকরণ
Removal of fatty acid.

অল্পক্ষণের জন্য তীব্র ক্ষার (alkali) কার্পাসতৈলের সংস্পর্শে আনিলে সমস্ত বাজে জিনিষ নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহাতে তৈলের ক্ষতি হয় না। এই পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া কষ্টিক পটাশ (caustic potash)-এর দ্বারা তৈল শোধন করা যায়। তৈলে ক্ষার সংযোগের সময় সাবধান হওয়া উচিত। কারণ, বেশী ক্ষারে তৈল নষ্ট হইয়া যায়। অতি নিকৃষ্ট তৈলের ক্ষেত্রে বেশী ক্ষার প্রয়োগ করা দরকার। বেশী ক্ষার প্রয়োগে পরিস্রুত তৈলের পরিমাণ

কমিয়া যায় বটে, কিন্তু সাবান তৈয়ারীর উপাদান সৃষ্টি হয়। ঐ উপাদান কাজে লাগাইলে, সর্ব্বসাকুল্যে ব্যয়ও কম পড়ে। চর্ব্বিময় য়্যাসিড (fatty acid) দূর করার পক্ষে কার্পাসতৈলে কষ্টিক পটাশ অপেক্ষা কষ্টিক সোডা প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

কার্পাসতৈলের রঙ্‌ দূরীকরণ

কার্পাসতৈল ক্ষারের দ্বারা পরিশোধিত হইলেও ইহার হরিদ্রাভ বা রক্তাভ বর্ণ দূর হয় না এবং এই কারণে ইহা মার্গারিণ ও উত্তম সাবান প্রস্তুতি ব্যাপারে ব্যবহার করিতে পারা যায় না। বর্ণ যথেষ্ট পরিমাণে দূরীভূত না হইলে লোকে ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে চায় না, সেইজন্য কার্পাসতৈলের বর্ণশোধন আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে ফুলার মাটি (Fuller's earth) ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ তৈলের ওজনের শতকরা ২-৩ ভাগ ফুলার মাটি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তৈল নিকৃষ্ট হইলে সময় সময় শতকরা ৬ ভাগও লাগে। শতকরা ১-২ ভাগ বোন চারকোল (bone charcoal) ব্যবহার করা হয়। সময় সময় ইহাতে ভাল ফল হয়। ফুলার মাটি ও বোন চারকোল (bone charcoal) মিশাইলে অধিকতর ভাল ফল পাওয়া যায়। ফুলার মাটি মিশাইবার পূর্ব্বে তৈল একেবারে রসশূন্য করা দরকার। রসশূন্য তৈল ৫০° হইতে ৬০° সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে ফুলার মাটি সংযোগ করা হয় এবং ২০-৩০ মিনিট নাড়িতে হয়। খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে গেলে তৈলে আধ ঘণ্টার বেশী ফুলার মাটি রাখা উচিত নয়। বেশী সময় রাখিলে তৈলের একপ্রকার বর্ণ ও স্বাদ হয়। তৈলের বর্ণ-দূরীকরণ-প্রক্রিয়া শেষ হইলে তৈল হইতে ব্লিচ্‌ (bleach—চূর্ণ ইত্যাদি) দূর করা দরকার। শোধনের সময় কেমিক্যাল ব্লিচ্‌ ব্যবহার করা

যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তৈলের সুগন্ধ নষ্ট হইয়া যায় এবং খাদনীয় তৈলের পক্ষে তাহা উত্তম নহে। তৈল নিকৃষ্ট ধরণের হইলে এবং ফুলার মাটি যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়া গেলে চূণ ও খনিজ য়্যাসিড্ ব্যবহার করা হয়। বর্ণের উন্নতি সাধনের জন্য অল্প পরিমাণে ক্লোরোফিল (chlorophyll) যোগ করা হয়।

কার্পাসতৈলের গন্ধ দূরীকরণ

জলপাই তৈলের পরিবর্ত্তে কার্পাসতৈল ব্যবহার করা যায়, এবং সেজন্য কার্পাসতৈলের গন্ধ দূর করা আবশ্যক। কার্পাসতৈল হইতে চর্ব্বিময় য়্যাসিড ও বর্ণ দূর করার পর গন্ধ দূর করিবার প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়। গন্ধ দূর হইলে কার্পাসতৈল মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহারের উপযোগী হয়।

কার্পাসতৈল-ঘনীকরণ

তৈল-ঘনীকরণ-প্রক্রিয়া সম্প্রতি আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে। তৈল-ঘনীকরণ-শিল্প আমেরিকা ও ইউরোপে একটি বিশেষ আবশ্যক শিল্পরূপে পরিগণিত হইতেছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৮ কোটী পাউণ্ড ক্রিস্‌কো (crisco) অর্থাৎ ঘনীভূত কার্পাসতৈল বিক্রয় হইয়াছিল। আজকাল ইহার পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। প্রধানতঃ খাদনীয় চর্ব্বি ও সাবান প্রস্তুতির ব্যাপারে কার্পাসতৈলের ঘনীকরণ আবশ্যক। তৈল জমাট হইলে দুর্গন্ধ থাকে না, কাজেই তৈলের গন্ধ দূর করা তেমন আবশ্যক হয় না। রন্ধন, পাউরুটী ও বিস্কুট তৈয়ারীর কাজে আজকাল বিভিন্ন দেশে জমাট কার্পাসতৈল ব্যবহৃত হইতেছে। চালান দেওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে তৈল ছিদ্র দিয়া পড়িয়া যাইত। তাহাতে যে

ক্ষতি হইত তাহা এখন আর হয় না। পরিস্রুত তৈল অপেক্ষা জমাট তৈল অধিক দিন, এমন কি, কয়েক বৎসরও অবিকৃত থাকে।

কার্পাসতৈল ঘনীকরণের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানতঃ এই তৈলই ঘনীভূত করা হয়। ঘনীকরণের পূর্ব্বে কার্পাসতৈল অতি অবশ্যই শোধন করিতে হয়। কার্পাসতৈলকে খুব সহজে "উদ্ভিজ্জ ঘৃতে" (vegetable product) পরিণত করা যায়। হল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী ও অন্যান্য বিদেশ হইতে আমদানী প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের উদ্ভিজ্জ ঘৃত পূর্ব্বে ভারতবাসী ব্যবহার করিত। আজকাল এই বাবদে এত বেশী টাকা আমাদের দেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যায় না। কারণ, এ-দেশে কয়েকটী তৈল-ঘনীকরণ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং সেগুলিতে যে কৃত্রিম ঘৃত (vegetable product) প্রস্তুত হয় তাহা বিদেশ-হইতে-আমদানী উদ্ভিজ্জ ঘৃত অপেক্ষা অনেক ভাল এবং দামেও সস্তা। এই সকল কারখানায় প্রত্যহ ২৫ হইতে ৩০ টন ঘনীভূত তৈল প্রস্তুত করা যায়। এই তৈল দামে কম হওয়ায় গরীব লোকেরা ইহা ব্যবহার করিয়া ঘৃতের অভাব মিটাইতে পারে। জমাট কার্পাসতৈল সাবান প্রস্তুতির চর্ব্বিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কাজেই কার্পাসতৈল-শিল্পের উন্নতি হইলে ভারতের অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইতে পারে। কারণ, ভারতের সাবান প্রস্তুতির জন্য যে চর্ব্বি বিদেশ হইতে কিনিতে হয় তাহা আর কিনিতে হইবে না। আমাদের দেশে প্রস্তুত প্রায় সমস্ত কৃত্রিম ঘৃত চিনাবাদাম তৈল হইতে হয়। কার্পাসতৈল হইতে এই ঘৃত প্রস্তুত করিলে তাহা গুণে উৎকৃষ্ট ও দামে কম হইবে এবং সরিষাতৈল অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হইবে। ইহাতে সাধারণের যথেষ্ট উপকার হইবে।

ভারতের কার্পাসতৈল-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা

দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতে প্রচুর পরিমাণ কার্পাসবীজ উৎপন্ন হইলেও তাহা ঠিকভাবে কাজে লাগান হয় না। এখন নাভ্সারী (Navsari)তে একটি মাত্র সুপরিচালিত ও সফলতা-সম্পন্ন কার্পাসতৈল কল আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু সবগুলিই কোন-না-কোন কারণে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তবে প্রধান কারণ দুইটি—(১) বীজ সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শুষ্ক বীজ-ভাণ্ডারের অভাব, (২) উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব এবং তৈল ও খইলের বিক্রয়-ব্যবস্থায় নানা অসুবিধা। অকৃতকার্য্যতার ফলে কল-সম্পর্কীয় লোকদিগের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তৈল ও খইল প্রকৃত মূল্যে দেশের মধ্যে ব্যবহৃত হইলে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই শিল্পে সফলতা লাভ করা যাইতে পারে। কার্পাস খইল অপেক্ষা কার্পাসবীজ গবাদির অধিকতর উপযুক্ত খাদ্য—এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে হইবে। কার্পাস খইল গবাদির পক্ষে অধিকতর উপযোগী খাদ্য ও ভূমির পক্ষে উত্তম সার—এই কথা কৃষিজীবীদিগকে ভালভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। কাজেই কার্পাস খইল রপ্তানী না করিয়া ভারতীয় গবাদি ও চাষের উপকারের জন্য ব্যবহার করা উচিত। এই খইল রপ্তানী হইলে ভারতের ভূমি ও গবাদি উভয়েরই পক্ষে ক্ষতি।

মিঃ সট্‌ক্লিফ্ (Mr. Sutcliffe) ভারতীয় কার্পাসবীজ লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—(১) মিশরীয় তৈল অপেক্ষা ভারতীয় তৈলে অধিক চর্ব্বিময় য়্যাসিড থাকে না। (২) উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইলে তৈলে বর্ণ থাকে না, এমন কি, আঁস্টে গন্ধও থাকে না। আমাদের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দ্বারা যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, মিঃ সট্‌ক্লিফের উক্তি সত্য।

সরকারের সহানুভূতিহীনতা, অর্থবান্ ভারতীয়গণের উদ্যমশূন্যতা এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি স্থাপন ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে উদাসীনতা ভারতের কার্পাসতৈল-শিল্পের বিফলতার জন্য দায়ী। তৈলবীজ-রপ্তানী বন্ধ, রপ্তানী বীজের উপর উচ্চ শুল্ক আদায় এবং রেলওয়ের মালবহনের ভাড়া হ্রাস করিয়া এই তৈল-শিল্প সমৃদ্ধ করা যায়।

ঘৃত-মাখনের ব্যবসায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতে উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা। ঐ ব্যবসায় উন্নত হইলে কার্পাসতৈল-শিল্পেরও প্রভূত উন্নতির সম্ভাবনা ঘটিবে। আমেরিকার কার্পাসতৈল-শিল্পের প্রসার ও প্রাচুর্য্য দেখিয়া মনে হয়, ভারতেও এই শিল্প নিশ্চিতই সমুন্নত হইবে।

ভারতের আধুনিক কার্পাসতৈল কারখানা

কার্পাসবীজ পেষণের জন্য ভারতে ছয়টি কারখানা আছে: সম্প্রতি কয়েকজন ভারতীয় শিল্পদক্ষ ব্যবসায়ী এই শিল্পের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। দিল্লীর লালা শ্রীরাম একজন উদীয়মান শিল্পী-ব্যবসায়ী। তিনি বৃহদাকারে একটি কার্পাসতৈলের কারখানা স্থাপন করিতেছেন। তাহাতে কার্পাসতৈল ও কার্পাসতৈল হইতে বিভিন্ন পাকা জিনিস (finished goods) তৈয়ারী করা হইবে।

পাঞ্জাবে কার্পাসবীজ-শিল্পের সম্ভাব্যতা

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে প্রচুর তূলা উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত খান্দেশ, ব্রোচ, ধারওয়ার, টিউটিকোরিন, পাঞ্জাব, সুরাট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলেও তূলা জন্মে। যদি ভালভাবে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হয়, তবে পাঞ্জাবের ভূমিতে ভাল কার্পাস জন্মিতে পারে। ব্রিটিশ ভারতে উৎপন্ন তূলার শতকরা আট ভাগ পাঞ্জাবে জন্মে। ১৯০৬-৭ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ লইয়া সমস্ত ভারতে ১৪,৬৯,০০০ একর জমিতে তূলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৭-২৮ সালে

১১,৩৪,১৫৩ একর জমিতে আমেরিকার তূলা এবং ১৩,৮৯,৭১৮ একর জমিতে ভারতীয় তূলার চাষ হইয়াছিল। ১৯২৭-২৮ সালে ও ১৯২৯-৩০ সালে যথাক্রমে ৫,১৭,৯০০ ও ৭,০০,৪০০ গাঁইট তূলা উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক গাঁইটের ওজন ৪০০ পাউণ্ড। তূলার কোষ হইতে তূলা ও বীজ বাহির করিলে দেখা যায়, বীজের ওজন তূলার ওজনের দেড়গুণ।

পাঞ্জাবে কার্পাসবীজ বাণিজ্যিক ব্যবহারে লাগাইবার ভাল ব্যবস্থা নাই। তূলা প্রধানতঃ অমৃতসর, ফিরোজপুর, লায়ালপুর, মণ্টগোমারি, সাহাপুর, রোটক ও হিসার জিলায় উৎপন্ন হয় এবং ইহার পরিমাণ ৭৫,০০০ টন। এই তূলার সমস্ত বীজই গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। পাঞ্জাবে কার্পাসতৈল-কল নাই, ফলে কার্পাসতৈল-শিল্প সেখানে আদৌ উন্নত নয়। পাঞ্জাবে বহু রকমের তৈলবীজ আছে। কিন্তু তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৩ ভাগ প্রাচীন পদ্ধতিতে আর বাকী ৭ ভাগ আধুনিক কলে পেষণ করা হয়। সমস্ত প্রদেশে ১১টি আধুনিক কল আছে। এই কলগুলির উন্নতির বিশেষ আশা করা যায় না। কারণ, কলগুলি ছোট ছোট এবং নিপুণ ও অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা পরিচালিত হয় না।

পাঞ্জাবের সাবানশিল্পের অবস্থা উন্নত নয়, ইহা সেখানে কুটির-শিল্পরূপেই প্রচলিত। যাহাদের সাবান-শিল্প সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান নাই বা সামান্য জ্ঞান আছে তাহারাই কাপড়-কাচা সাবান প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত। ক্যাল্‌কাটা সোপ ওয়ার্কস্‌ বা পাঞ্জাব সোপ ফ্যাক্‌টারীর মত একটিও প্রতিষ্ঠান সেখানে নাই। তৈলশিল্পের অনুন্নতি সাবানশিল্পের অনুন্নতির কারণ।

জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশবাসী ভারতীয় অর্থ ও শ্রমে উৎপন্ন দেশী জিনিষ ব্যবহারে উৎসুক হইয়াছে, কাজেই এই সময় উত্তম বীজ ও উন্নত যন্ত্রপাতি লইয়া অর্থবান্‌ উৎসাহী ভারতীয়গণ

কাজ আরম্ভ করিলে নিশ্চিতই লাভ হইবে। এই সঙ্গে কলে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারেরও অন্বেষণ করিতে হইবে। এই সব ব্যাপারে জনসাধারণকে উৎপন্ন দ্রব্যের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য কিছু বিজ্ঞাপন বা প্রোপাগাণ্ডারও প্রয়োজন আছে।

অমৃতসর বা লাহোর কার্পাস-আবাদ অঞ্চলের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং এই সব স্থানে তৈল ও সাবান প্রভৃতি বিক্রয়ের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে। সেইজন্য এই সব স্থানে কল স্থাপনের উপযোগিতা অধিক। যদি খইল ঐ সব স্থানে বিক্রয় না হয় তবে নিকটবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত করাচী বন্দর হইতে জাহাজে করিয়া অন্যত্র চালান দেওয়া যাইতে পারে। তৈল সম্বন্ধে ভাল ধারণা আছে এবং বিশেষভাবে কার্পাসতৈল সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান আছে এমন লোকের পরিচালনায় কল থাকা উচিত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক কোম্পানি কার্পাসবীজ সম্বন্ধে উন্নত ধরণের যাবতীয় যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছেন।

কার্পাসতৈল নিষ্পেষণের যন্ত্রপাতি

আমেরিকার সহিত ভারতের নানাদিক্ দিয়া সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে এবং আশা করা যায়, যুদ্ধোত্তর কালে এই সম্বন্ধ প্রসার লাভ করিবে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তখন আমেরিকার যন্ত্রনির্ম্মাতাগণ কার্পাসতৈল-শিল্পের উপযোগী সর্ব্বপ্রকার উত্তম যন্ত্রপাতি আমাদিগকে সরবরাহ করিতে পারিবেন। যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্পাসবীজ উৎপন্ন হয়। কার্পাসবীজ হইতে যত রকম দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে, আমেরিকার ব্যবসায়িগণ তাহাদের সবই সম্ভব করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট

যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত করাইয়াছেন। কার্পাসবীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের কয়েকটি যন্ত্রপাতির নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) Sieving cylinders. (২) Decorticator. (৩) Double shaker. (৪) Hull-beater. (৫) Delinting machine complete. (৬) Expeller with heating apparatus. (৭) Filter press. (৮) Oil-pump. (৯) Oil-collecting tank. (১০) Oil tank for filtered oil. (১১) Oil discharging tank. এই সকল যন্ত্রপাতি ব্যতীত কার্পাসতৈল পরিশোধন ও ঘনীকরণের জন্য কিছু যন্ত্রপাতি আবশ্যক।

প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টা চালাইয়া ১০০ টন কার্পাসবীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন করিতে গেলে যে যন্ত্রপাতি দরকার তাহার মূল্য দশ লাখ টাকা। এই টাকায় তৈল-পরিশোধন ও -ঘনীকরণ যন্ত্র, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন যন্ত্র, বসাইবার ব্যয় প্রভৃতি সবই সংকুলান হইয়া যাইবে।

আমেরিকার যন্ত্রপাতি বসাইয়া কার্পাসবীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন করিলে তাহার প্রতিমণে ৮৲ টাকা ও ঘনীভূত তৈলের প্রতিমণে ১০৲ টাকা খরচ পড়িবে। এই উপায়ে বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাসও পাওয়া যাইবে। ভাঙ্গা যন্ত্রপাতি জোড়া দেওয়া প্রভৃতি কাজের জন্য এই গ্যাসের যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই গ্যাস বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ পাওয়া যাইবে, ইহাতে ঘনীভূত তৈলের মূল্য কম হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে উদ্ভিজ্জ ঘৃতের মূল্য প্রতিমণ ২০৲ টাকার অধিক ছিল। কাজেই একথা বলা আবশ্যক যে, এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইবে। ভারতে কার্পাসতৈল-শিল্প উন্নত হইলে আমেরিকার মত শিল্পোন্নত দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনে সুবিধা হইবে।

এই প্রবন্ধে যে সমস্ত হিসাব ও দ্রব্যতালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই সহজেই বুঝা যাইবে যে, কার্পাসবীজ হইতে কৃত্রিম

ঘৃত ব্যতীত অন্যান্য অনেক জিনিষ তৈয়ারী করা যায় এবং এই ব্যবসায়ে মার্কিণ যন্ত্রপাতি-ব্যবসায়ী ও -প্রস্তুতকারী এবং তৈল-বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা পাওয়া যাইতে পারে।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এদেশে কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে কৃত্রিম ঘৃত প্রস্তুত হইতেছে। কৃত্রিম ঘৃত বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে, এবং ইহার চাহিদা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে নিশ্চিতই হইতে থাকিবে। সাবান-শিল্পের প্রসারের সহিত, বিদেশ হইতে আমদানী ট্যালো (tallow)র পরিবর্ত্তে ঘনীভূত চর্ব্বি ব্যবহার করার জন্য আমাদের দেশে তৈল-ও চর্ব্বি-ঘনীকরণের আবশ্যকতা তীব্র-ভাবে অনুভূত হইতেছে।

উক্তরূপে তৈলনিষ্কাশনের জন্য আমাদের দেশের তৈলবীজ নিষ্পেষণ-শিল্পে আধুনিক উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে। কারখানাগুলিতে তৈল-পরিশোধন ও গন্ধদূরীকরণের ব্যবস্থাও হইতেছে। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বলা যায় যে, আমাদের দেশের তৈলশিল্প ক্রমোন্নতির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে কার্পাসবীজ নিষ্পেষণের দিকে তেমন কেহই মনোযোগী হন নাই। কাজেই ভারতীয় অর্থশালী ব্যক্তিগণের কার্পাস-বীজ নিষ্পেষণ এবং কার্পাসতৈল ও খইল হইতে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতির দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত। আমাদের মনে হয়, এদেশে বর্ত্তমান বড় বড় তেলের কারখানার সহিত ঠিকভাবে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য, সমস্ত আবশ্যক যন্ত্রপাতিসহ প্রত্যহ ২৫০ টন বীজ নিষ্পেষণের উপযোগী কার্পাসবীজ-নিষ্পেষণ-কারখানা স্থাপন করিলে ফল ভালই হইবে। এই কারখানায় প্রথমে ক্রুড (crude), পরিস্কৃত (refined), গন্ধহীন (deodorised), ঘনীভূত (hardened) তৈল ও পরে ক্রমশঃ

অন্যান্য জিনিস তৈয়ারী করা যাইতে পারে। এইরূপ কার্পাস-বীজ-নিষ্পেষণ-যন্ত্রের মূল্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা।

উপসংহার

তৈলবীজ উৎপাদনে প্রকার ও পরিমাণ উভয় দিক্ দিয়া পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান সর্ব্বোচ্চ। ভারতে প্রায় ৫০০ রকমের তৈলবীজ পাওয়া যায় এবং মোট প্রায় ১ কোটি টন বীজ সংগৃহীত হয়। ইহা ব্যতীত অনেক পরিমাণ বীজ সংগৃহীত হয় না বলিয়া বাজে নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতে মোট যত বীজ উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৪০ অংশ তূলাবীজ এবং ইহার সংগ্রহে কোন অসুবিধা নাই। অতএব এই বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন এবং তাহার বাণিজ্যিক ব্যবহার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশে এই জিনিসটি উপেক্ষিত অবস্থায় ছিল।

ভারতের সকলের নিকট সুপরিচিত স্বনামধন্য স্যার জেম্‌শেদজী টাটা যখন ভারতবর্ষকে শিল্পসমৃদ্ধ করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তখন তাঁহার চিন্তার মধ্যে চারিটি পরিকল্পনার স্থান ছিল। তিনি দেখিলেন, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, ইহার শতকরা ৮০ জনের বেশী লোক কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করে। ইহার আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে, প্রথম কৃষিকার্য্যের উন্নতি দরকার এবং কৃষির উন্নতি করিতে হইলে চাষের উপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপযুক্ত পরিমাণ সারও একান্ত আবশ্যক। তিনি যন্ত্রপাতির জন্য লৌহকারখানা স্থাপন এবং সারের জন্য তূলাবীজ নিষ্পেষণের পরিকল্পনা করিলেন। যাহাতে তূলাবীজের খইল সাররূপে এবং কার্পাসতৈল অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হইতে পারে সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। কৃষির উন্নতি করিতে হইলে

কৃষি-সম্পর্কিত শিল্প (যথা, তেলের কারখানা, চিনির কারখানা ইত্যাদি) স্থাপিত হওয়া উচিত এবং এই জাতীয় শিল্প স্থাপন করিতে হইলে সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া একান্ত আবশ্যক। সেজন্য তিনি একটি হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক স্কীম (hydro-electric scheme) তৈয়ারী করেন। তারপর শিল্পের সমুন্নতির জন্য গবেষণা প্রয়োজন, সেজন্য তিনি একটি উচ্চাঙ্গের গবেষণাগার স্থাপনের মতলব করেন। আনন্দের বিষয় এই যে, তাহার জীবিত অবস্থায় তিনি চারিটি পরিকল্পনারই রূপ দান করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারিগণ তাহার স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার লৌহকারখানা টাটানগরে, তৈলের কারখানা টাটাপুরমে স্থাপিত হয়। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের উপরে সঞ্চিত জলরাশি হইতে সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি সন্নিহিত স্থানে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্রপাতি (hydro-electric plant) স্থাপন করেন এবং রাসায়নিক গবেষণার জন্য বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দির (Indian Science Institute) নামে একটি উচ্চাঙ্গের গবেষণাগার স্থাপন করেন। টাটা ভারতের সর্ব্বোত্তম শিল্পী-ব্যবসায়ী এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এদেশের শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

টাটা তৈলের কারখানা স্থাপন করিলেও নানাকারণে বহু দিন যাবৎ ঐ কারখানায় তুলাবীজ নিষ্পেষণ হয় নাই। শুনা যাইতেছে, বর্ত্তমান সেখানে তুলাবীজ নিষ্পেষণ আরম্ভ হইয়াছে। আজ হইতে ২০;২৫ বৎসর পূর্ব্বে কাণপুরে তুলাবীজ হইতে তৈল ও তৈল হইতে অন্যান্য জিনিষ প্রস্তুত করিবার জন্য একটি বড় কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব হয় এবং সেজন্য এক কোটি টাকার বেশী মূলধন সংগৃহীত

হয়। কিন্তু মূলধনের নানা অপব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বর্ত্তমান সুখের বিষয় যে, মোদি ব্রাদার্স মীরাটের নিকটবর্ত্তী বেগমাবাদ নামক স্থানে (মোদি নগর) ভারতীয় তৈলবীজ নিষ্পেষণ এবং তৈল ও খইল হইতে নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুতির জন্য একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানে এখন কার্পাসবীজ নিষ্পেষিত হইতেছে। লালা শ্রীরাম দিল্লীতে একটি অনুরূপ কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে ভারতে এই জাতীয় কারখানা অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হইবে এবং ভারতে উৎপন্ন সমস্ত তূলাবীজের বাণিজ্যিক সদ্ব্যবহার হইবে আর তদ্দ্বারা ভারতের কৃষি ও শিল্প উভয়েরই উন্নতি অগ্রসর হইবে।

এখানে বলা বিশেষ আবশ্যক যে, ভারতীয় কার্পাসবীজ আমেরিকার কার্পাসবীজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে, তবে নিকৃষ্টতার জন্য ইহার সদ্ব্যবহারে নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। তৈল শিল্পের দিক্ দিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, বীজ যত উৎকৃষ্ট হইবে তাহা হইতে তৈল ও অন্যান্য জিনিষগুলি ততই উৎকৃষ্ট হইবে এবং পরিমাণে বেশী হইবে, লাভও বেশী হইবে। কাজেই কার্পাসবীজের উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক হইয়াছে। জলবায়ুর গুণানুসারে যেমন জীবজগতে সঙ্কর-উৎপাদন (cross breeding)এর প্রয়োজন আছে, তেমনি উদ্ভিদ-জগতেও আছে। জীবজগতে যে সঙ্কর-উৎপাদনের দ্বারা সুফল পাওয়া যায় তাহার বহু প্রমাণ আছে। সঙ্কর-উৎপাদন সাহায্যে ভারতীয় কার্পাসবীজের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা আছে, এবং ইহা দ্বারা ভারতের অন্যান্য তৈলবীজ ও অপরাপর শস্যের উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কাজেই ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে গাছ-উৎপাদন (plant breeding)এর গবেষণা ও সুফল প্রয়োগ বহু পরিমাণে হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আলামোহনের বাঙালীয়ানা

ও

শিল্প-বাণিজ্য-প্রসারের ধারা

শ্রীননীলাল রায়, এম্. এ.

কর্ম্মবীর আলামোহন দাশের অচিন্তিতপূর্ব্ব কর্ম্ম-সাফল্য ও অগ্রগতি প্রসঙ্গে কিছু দিন পূর্ব্বে লিখেছিলাম—"আলামোহন বাস্তবিকই এক অলৌকিক রহস্য। তবুও এ রহস্যের সমাধান হবেই, এবং সে শুধু সেইদিনই—যেদিন এক বিরাট অখণ্ড নির্ভীক, নির্ব্বিকার, নিরবচ্ছিন্ন জাতীয়তাবোধই হবে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র আদর্শ এবং সাধনা! 'এক দেশ, এক জাতি, এক সর্দ্দারে'র স্বাধীন আব্‌হাওয়ায় আলামোহনের সাধনা ও শিল্প-অভিযান যদি দুর্ব্বার গতিতে অগ্রসর হ'তে পেতো, তবে তা'র সম্ভাবনা আরও কতই না বিপুল ও বিস্ময়কর হ'তে পার্‌তো!" আজ আমাদের বল্‌তে দ্বিধা নেই যে, কর্ম্মবীর আলামোহনের বিভিন্ন শিল্প-ব্যবসায়ের ক্রম-প্রসার, বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙালী জাতির কর্ম্মবিমুখতার দুর্ণাম দূরীভূত ক'রে তাকে এক বিপুল ও ব্যাপক কর্ম্মোন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছে। আলামোহন এই নবজাগ্রত জাতির এক জ্বলন্ত আদর্শ তিনি বাংলার কিশোর-তরুণ, প্রৌঢ়-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র, শিল্পী-কৃষক, ব্যবসায়ী-অ-ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী-শ্রমজীবী, সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক সর্ব্বশ্রেণীর সকল নরনারীকে এক অখণ্ড বাঙালী জাতি গঠনের বাণী শুনিয়েছেন। আলামোহন বাঙালী, তাঁর স্বপ্ন বাংলা আর বাঙালী। তাঁর প্রতিটি বাক্যে, আচরণে, অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে তাঁর বাঙালীয়ানার এই অপূর্ব্ব ভঙ্গীটি এবং তাঁর সকল কর্ম্ম

ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্রম-প্রকাশ ও -প্রসারের সম্যক্ ধারণা করতে হ'বে তাঁর এই বাঙালীয়ানার অমলিন রূপায়নে।

আলামোহন প্রধানতঃ শিল্পী ও ব্যবসায়ী। তাঁর শিল্প-সাধনা ও বাণিজ্য-প্রচেষ্টার বলিষ্ঠ প্রকাশ হয়েছে দাশনগরে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতে 'দাশনগর মরণোন্মুখ বাঙালীর তীর্থক্ষেত্র'। শ্রমবিমুখ অব্যবসায়ী বাঙালীর বাংলায় দাশনগরের প্রতিষ্ঠা নব্য বাঙালী জাতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় গৌরবময় ঘটনা। যে অর্থনৈতিক পটভূমিকায় দাশনগরের অভ্যুদয় তা'কে উপলব্ধি করতে হ'লে আজ থেকে পঞ্চাশ বছরের অতীত বাংলার দিকে তাকাতে হ'বে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাঙালীর জীবনে যে জাগরণের ছোঁয়াচ লেগেছিল তার প্রাণ-প্রাচুর্য্যের প্রকাশ-ব্যঞ্জনায় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তৎকালীন তরুণ বাংলার যে ক্রটী ও অক্ষমতা আত্মগোপন ক'রে ছিল, তাকে দূরীভূত করতেই যেন আলামোহনের আবির্ভাব ও দাশনগরের অভ্যুদয়। বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। তাই স্বদেশীযুগের ভাবের বন্যায় বাঙালী আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম—কিন্তু তেমন পাড়ি জমাতে পারলাম না। বোম্বেওয়ালারা কতকটা পেরেছিল বোম্বাই-আমেদাবাদের কাপড়ের কলে, জামসেদপুরের লোহার কারখানায়। সাধারণের মনে আজ এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, তিরিশ বছর পূর্ব্বের সহায়-সম্পদ্-শূন্য ফেরীওয়ালা আলামোহন কোন্ স্বপ্ন, চিন্তা ও আদর্শের অনুপ্রেরণায় কি মূলধন সম্বল ক'রে আজ ভারত জুট মিল, ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোং, দাশ ব্যাঙ্ক, হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং, এশিয়া ড্রাগ কোং, আরতী কটন মিল, ইণ্ডিয়ান প্রডিউস, দাশ কর্পোরেশান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার! কৌতূহলপ্রবণ মানুষের এই প্রশ্নের উত্তর আলামোহনের নিজের বাণীতেই পাওয়া যায়।

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষকে শিল্পায়িত করতে না পারলে, বাঙালীর আরামপ্রিয় চিত্তকে শ্রমসাধ্য ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট করতে না পারলে ভারতের জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধির পথে কল্যাণ আসতে পারে না। কৃষিজাত ও প্রকৃতিপ্রদত্ত কাঁচামালকে শিল্পজাত পাকামালে রূপান্তর দ্বারা একটা দেশের সম্পদ্ গড়ে' উঠে। যে দেশের কাঁচামাল যে পরিমাণে বেশী সেই দেশ যদি সেই পরিমাণে তা' থেকে পাকা মাল উৎপাদন করে আর তা নিয়ে দেশ-বিদেশের বাজার দখলে আনতে পারে, তবেই তার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যকে সম্যক্ উন্নত বলা যায়। আলামোহন কৈশোরে এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই ফেরিওয়ালার কাজে যৎসামান্য অর্থার্জ্জন করেই যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কাজে আকৃষ্ট হন। কারণ যন্ত্রব্যতীত পূর্ণাঙ্গ শ্রম-শিল্প দ্রুত গড়ে উঠতে পারে না। আলামোহনের এই চিন্তাধারা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে সহজে বোধগম্য হবে।

"আমাদের দেশে যে-কোন কারখানা স্থাপন করিতে হইলেই কারখানা-প্রতি গড়ে ১০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। দেশে কলকব্জা যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা থাকিলে প্রথমতঃ ঐগুলি সুলভ হইতে পারিত বলিয়া এক দিকে যেমন কলকারখানার প্রসার লাভ হইত, অন্য দিকে তেমনই বহুসংখ্যক লোক এই কলকব্জা-নির্ম্মাণকারী কারখানাগুলিতে কাজ করিয়া অন্নসমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান করিতে পারিত। এখানে কলকব্জা যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিতে না পারিলে এই ভীষণ প্রতিযোগিতার যুগে যে বিদেশীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠা যাইবে না, এই তত্ত্ব স্বকীয়-সহজ-বুদ্ধি-বলে ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আলামোহন দাশ এদিকে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।"

উল্লিখিত আদর্শের ভিত্তিতে আলামোহন যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং 'বি, ডবলিউ, স্কেল', 'পালস্ এঞ্জিনিয়ারীং ওয়ার্কস' ও 'এটলাস ওয়েব্রীজ এণ্ড এঞ্জিনিয়ারীং কোং'কে একত্র ক'রে বর্ত্তমান 'ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী'র প্রতিষ্ঠা করেন।

নিজ কারখানায় প্রস্তুত অনেক যন্ত্রপাতি দিয়ে আলামোহন বাঙালীর দ্বিতীয় পাট-কল 'ভারত জুট মিলস্' স্থাপন করেন। অথচ এই প্রচেষ্টার কথা শুনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রই একদিন আলামোহনকে পাগলা গারদে পাঠাবার বিধান দিয়াছিলেন!

পাট বাংলার একচেটে কৃষি-সম্পদ্। এই পাট থেকেই পাকা মাল প্রস্তুত ক'রেই বিদেশী ও বিপ্রদেশী বণিক্‌সম্প্রদায় বাংলার বুকে ব'সেই বাংলা দেশ থেকে কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন কর্‌ছে। এই দৃশ্য আলামোহনের অন্তরকে একান্তভাবে অভিভূত করেছিল ব'লেই তিনি অজস্র বাধাবিপত্তিকে নিষ্পেষিত ক'রে কৈশোরের কল্পনাকে আজ জীবন্ত সত্যে পরিণত ক'রে তুলেছেন।

তারপর দাশ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। শিল্পী ও ব্যবসায়ী আলামোহন আরও কলকারখানা স্থাপন না ক'রে দেশে এত ব্যাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও কেন আর একটা ব্যাঙ্ক খুল্‌তে গেলেন—এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন—

"আমি নিজেই একজন ইণ্ডাষ্ট্রীয়েলিষ্ট ব'লেই জাতীয় জীবনে ব্যাঙ্কের তাৎপর্য্য সম্যক্‌রূপে বুঝ্‌তে পেরেছি; এবং ব্যাঙ্ক যে খুল্‌তে যাচ্ছি, তাও কেবল ঐ ইণ্ডাষ্ট্রীরই দাবীতে।"

ইণ্ডাষ্ট্রীর সম্যক্ প্রসার ও উন্নতি কর্‌তে গেলে মূলধনের প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক হ'চ্ছে এই মূলধনের অর্থাৎ সক্রিয় ও সচল অর্থের প্রতিভূ। ব্যাঙ্ক ও ইণ্ডাষ্ট্রী এতদুভয়ের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বিদ্যমান।

একদিকে যেমন ব্যাঙ্ক না থাক্‌লে উপযুক্ত ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে' উঠ্‌তে পারে না, অপর দিকে তেমনই নানাপ্রকার ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে' উঠে দেশের কাঁচা মালকে বাণিজ্য-সম্ভারে পরিণত না কর্‌লে ব্যাঙ্কের প্রসার ঘটে উঠ্‌তে পারে না। বিলাতে এবং জার্ম্মাণ, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শিল্পোন্নতি যে এত বিপুল তার মূলে তদ্দেশীয় জাতীয় ইণ্ডাষ্ট্রীর সহায়ক জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি। আলামোহন তাঁর শিল্প-জীবনের প্রথম অবস্থায় যথোপযুক্ত অর্থের অভাবে বহুবার বিড়ম্বিত হয়েছেন।

"প্রথম যখন আমি ভারত জুট মিল প্রতিষ্ঠা কর্‌তে ইচ্ছা করি তখন আমাকে দেশবাসী কিংবা দেশী ব্যাঙ্ক অর্থ সাহায্য করা ত দূরের কথা, অনেকেই আমাকে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ কর্‌তে দ্বিধাবোধ করেন নি।"

আলামোহনের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য—দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ইণ্ডাষ্ট্রীকে গড়ে উঠ্‌তে সহায়তা ক'রে বাংলার জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধি করা।

বিদেশী ধনিক ও বণিক্ সম্প্রদায়ের পরিচালিত মিলগুলি একদিকে বাংলার অর্থসম্পদ্ শোষন ক'রে ফেঁপে উঠ্‌ছিল, আর অন্যদিকে কোটি কোটি টাকার বিদেশী বস্ত্র কিনে আমরা তাদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ কর্‌তেও কুণ্ঠিত হইনি। ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালী যুবক আলামোহন তখন ভাব্‌তেন—

"যুগ যুগান্ত ধরে' অ-বাঙ্গালীরা আমার বাঙ্গালার ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—সবার চেয়ে বেশী লুণ্ঠন করেছে বর্গীরা; কিন্তু তাও বছরে দশ কোটী টাকার উপর যায় না। আমি যখনকার কথা বল্‌ছি তখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ চল্‌ছিল। তখন আমাদের দেশে কাপড়ের কল-কারখানা তেমন ছিল না, বা আজও নাই। বাংলার বাহির থেকে আমদানি কাপড় দিয়েই

সে সময় আমাদের মা-বোনেরা কোন রকমে তাঁদের লজ্জা নিবারণ করতেন। তখন প্রতি জোড়া কাপড় ছয় টাকা ক'রে বিক্রী হ'ত। হিসাবে দেখ্‌তে পেলাম প্রতি বৎসর এক কাপড়ের দোহাই দিয়েই আমার বাংলাদেশ থেকে প্রায় চল্লিশ কোটী টাকা অ-বাঙ্গালীদের হাতে চলে যাচ্ছে।"

বাঙালীর এই অসহায় অবস্থায় ব্যথিত আলামোহনের শিল্প-প্রতিভা আজ তাই দাশনগরে কাপড়ের কল স্থাপনে নিয়োজিত।

আলামোহন ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলিষ্ট ও ব্যাঙ্কার। ইন্‌সিওরেন্সের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর সুনিপুণ পরিচালনা শক্তি প্রয়োগ করেছেন। জীবনবীমা রূপ একটা আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত সঞ্চয়-পদ্ধতি জাতির সুখ-সম্পদ্ বৃদ্ধির সম্যক্ সহায়ক এবং ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য আবশ্যক ব'লেই আলামোহন 'হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সামান্য উপার্জ্জনে যাদের সংসার চলে তাদের সুবিধার জন্য 'ইন্‌কর্পোরেটেড্ প্রভিডেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী' পরিচালনা করছেন।

বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার দিনে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী-প্রপীড়িত দেশের জনসাধারণ উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য অভাবে অ-চিকিৎসা ও অপচিকিৎসায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হচ্ছে, যুদ্ধের জটিলতায় বিদেশ থেকে ঔষধপত্র আমদানী এক প্রকার বন্ধ; কাজেই এদেশে ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। তদুদ্দেশ্যে আলামোহন 'এশিয়া ড্রাগ কোং' প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্ত্তমান ও যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল।

বাংলার মাটীতে প্রচুর ইক্ষু উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও বাঙালীকে বাংলার বাহির থেকে চিনি এনে খেতে হয়। অথচ বাংলার শর্করা-

শিল্পের বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রচুর সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনার সুফল লাভের জন্য আলামোহন "দাশ সুগার কর্পোরেশন" নামে একটি কোম্পানী পরিচালনা করিতেছেন।

বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুইটী বিশ্বব্যাপী মহাসমর সংঘটিত হ'ল। কত দেশের বুকের উপর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে রক্তকলঙ্কিত ক'রে দিল। এতে প্রমাণ হচ্ছে মানুষ এখনও তার সত্য রূপ ও কল্যাণের পথে যোগ্যতা অর্জ্জন করেনি। বিশ্বব্যাপী ধ্বংস ও রণোন্মত্ততা আত্মঘাতী স্বার্থের বিষবাষ্পে মানুষের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও শুভ-বুদ্ধিকে সমাচ্ছন্ন করতে উদ্যত। এই অনবচ্ছিন্ন অনর্থপাতের মূলে শুধু একটিমাত্র মনোবৃত্তি—শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণক্ষেত্রে স্ব স্ব প্রধান জাতিসমূহের স্বাধিকার-প্রমত্ততা। সমগ্র বিশ্বকে যুদ্ধবর্জ্জিত ক'রে বিশ্বে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যুদ্ধোত্তর যুগের সকল দেশের শিল্প-বাণিজ্য-শাসন-নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু গবেষণা-গোষ্ঠী গড়ে উঠ্ছে। কিন্তু বিশ্বের সংগঠন-পরিকল্পনার নিয়ম ও নীতি, উপযুক্ত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য-হীন পরাধীন বাংলা তথা ভারতের ভাগ্যে প্রযুক্ত হ'তে পারে কিনা সন্দেহের বিষয়। কারণ বাংলা এখনও শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী ও স্বয়ম্পূর্ণ হ'তে পারে নি। আজ সর্ব্বথা দুর্ব্বল বাংলার জাতীয় শিল্পোন্নতির যুগসন্ধিক্ষণে যথার্থ জাতীয়তাবোধসম্পন্ন ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্টদের নির্দ্দেশ ও নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন। বাঙালীর অতীব আশার কথা এই যে, বর্ত্তমান বাংলার ধূসর তামসিকতার দিক্‌চক্রবালে আলামোহনের মত আন্তরিক জাতীয়তাবাদী শিল্পী-ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটেছে। এই আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত হ'লেও আকস্মিক নয়, এবং আলামোহনের কর্ম্মপ্রতিভার প্রকাশ একটা সামঞ্জস্যহীন খামখেয়ালী কর্ম্মবিলাসও নয়, একটা আবাল্য-পোষিত

সুচিন্তিত কর্ম্মপরিকল্পনা আলামোহনের সমগ্র প্রতিষ্ঠানের পিছনে রয়েছে। এই পরিকল্পনাকে সজীব ক'রে তুলেছে আলামোহনের অবিচল জাতীয়তাবোধ, তাঁর নিখুঁৎ বাঙালীয়ানা। এই বাঙালীয়ানার সত্য ও ব্যাপক আদর্শকে সার্থক ক'রে তুল্‌বার মহাব্রতে আলামোহন কেবল বাঙালী শিল্পী-ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক ও অর্থপতিদিগকে নয়, কবি আর সাহিত্যিকদিগকেও আহ্বান করেছেন।

"জাতিতে আমরা বাঙালী—এই নূতন নিশান উড়িয়ে, জাত, কুল, বর্ণের আবর্জ্জনাকে পদদলিত ক'রে বুদ্ধিমান বাঙালীকে জীবনের পথে, জয়ের পথে, অমরত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পার্‌বে বাংলা সাহিত্য আর বাঙালী সাহিত্যিক।

আজ আমাদের নূতন ছাঁচের সাহিত্য চাই, যে সাহিত্যের প্রভাবে পাঠকের মনে কাজের প্রেরণা আস্‌বে, উন্নতির জন্য, অভিযানের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌বে। এমন কবিতা চাই যার প্রভাবে বাঙালী-চিত্ত থেকে পুরুষানুক্রমিক ভাবে সঞ্চিত বিভেদ-বৈষম্যের কলুষ ধুয়ে মুছে যাবে। এমন নাটক, উপন্যাস আর ছবি চাই যা' পড়ে এবং দেখে বাংলার যুবক-যুবতীরা বুঝ্‌তে পার্‌বে যে তারা একটা বিরাট জাতি—একটা বিপুল সমাজ—আর সেই জাতি আর সমাজের নাম হচ্ছে বাঙালী।" *

* শ্রীমহেন্দ্রজিৎ সিংহ-ফুকন কর্ত্তৃক সম্পাদিত "আলামোহন দাশের বাণী" পুস্তকে কর্ম্মবীরের মনোরাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বাঙ্গালী

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী

আত্মবিস্মৃত জাতির দুর্গতির সীমা নাই। একক মানুষ বা জাতি যখন নিজের উপর আস্থা হারায় তখন তাহার উন্নতির সম্ভাবনা লোপ পায়। নৈরাশ্য, পরনির্ভরশীলতা, সন্দিগ্ধচিত্ততা ও অসহায়ভাবে যাহারা পূর্ণ তাহাদের মধ্যে উদ্যম সৃষ্টি করা অত্যন্ত শক্ত। সেইজন্য দেবতার কৃপায় যুগে যুগে সকল অসহায় অবস্থা মন্থন করিয়া কুলকুণ্ডলিনী শক্তি প্রকট হয় এবং জাতির মনঃপ্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন শক্তি সন্ধানে নিযুক্ত করে। ইহা ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারা এবং যেদেশে প্রকৃতি নানা যোগাযোগের ভিতর দিয়া পরিবর্ত্তন ও উদ্বেগ আস্ফালন ও সমতা সম্ভব ও সমন্বিত করে সেই দেশে এই স্বাভাবিক ধারা সহজে মূর্ত্ত হয়। প্রকৃতির এই বিরাট বিভূতি বাংলার বুকে যেমন মূর্ত্ত তেমন আর কোথায়? উত্তরে অভ্রভেদী গৌরীশৃঙ্গ, দক্ষিণে অফুরন্ত অক্লান্ত উর্মিমালার অবিরাম নৃত্য। বিভিন্ন নদনদী স্নায়ু ও ধমনীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া উর্ব্বরাশক্তি ও প্রাচুর্য্যে বাংলার মাটি সজীব করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ প্রদেশে বর্ষা এমন অবাধে জল ঢালে, কোন্ প্রদেশে ষড় ঋতু শর-যোজনায় মানুষের মনে এমন কল্পনা-পরিকল্পনা উদ্বুদ্ধ করে—যেমন বাংলা দেশে! বিচিত্র ধারা সাধনায় বৈচিত্র্য আনিয়া সকল দুর্দ্দশার মধ্যেও প্রেরণা ও দ্যোতনা পরিবেশন করে, সেইজন্য বাঙ্গালী জাতি আদিকাল হইতে বহু পরিবর্ত্তন ও বিপর্য্যয়ের মধ্যেও অন্তর্নিহিত শক্তির নবপ্রকাশ ও নবচ্ছটার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। বাংলার আবহাওয়া

যেমন ঋতুপর্য্যায়ে পরিবর্ত্তনশীল, বাংলার প্রাণও তেমনি জাতির সকল বিপর্য্যয়ের মধ্যেও নব সংজ্ঞায় জাগ্রত হইবার অধিকারে অভিষিক্ত।

মোগল বাদশার শক্তি ও প্রভাব, সাম্রাজ্য শাসনের আয়োজন ও ব্যবস্থা সঙ্কুচিত ও শক্তিহীন হইবার প্রাক্কালে পাশ্চাত্য শ্বেত জাতির ক্রম-উপনিবেশ স্থাপনকালে কালের দুর্ভেদ্য ব্যবস্থায় দেশ বিভ্রান্ত অবস্থায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দিন কাটাইতেছিল। চতুর বিদেশী বণিকের তুলদণ্ড যখন পলাশীর যুদ্ধের পরে মানদণ্ডে পরিণত হইয়াছিল তখন বিক্ষোভ বাঙ্গালীর প্রাণকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। মোগল-অধীনতা স্বীকার করা সত্ত্বেও বাঙ্গালী তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণসত্ত্বাকে লুপ্ত হইতে দেয় নাই। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালী ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিদেশী বণিকদের সহিত অতি সহজে যোগাযোগ স্থাপন করে। এই পরিস্থিতিতে আমরা ব্যবসাক্ষেত্রে প্রথম পরিচয় লাভ করি চতুর অক্রুর দত্তের জীবনে। তিনি যেমন চালাক ছিলেন তেমনি কর্ম্মঠ ছিলেন। ইংরেজ কলিকাতার প্রারম্ভিক পঞ্চগ্রাম গ্রহণ করিয়া যখন ব্যবসাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহর সংগঠনে মনোযোগ দিল, তখন অক্রুর দত্ত সহরের ঘর তৈয়ারীর মামুলী জিনিষসকল সরবরাহ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া ছোট ছোট দড়ীকল ও সুরকীর জাঁতাকল চালাইতে লাগিলেন। বাংলা তথা ভারতের নৈরাশ্যময় যুগে এই একটি বাঙ্গালী যুবক আত্মশক্তি ও আত্মমর্য্যাদার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিলেন। ইংরেজ বণিক্‌দের নিকট একদিকে এই যুবক যেমন সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাহাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রতিবাদ করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। ব্যবসায়ে অদ্ভুত সমৃদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রভাব ও সম্মান

সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে এ জাতীয় চরিত্রের প্রকাশ বাংলার মাটি এবং আবহাওয়াতেই সম্ভব ছিল। চৈত্রের খট্‌খটে রৌদ্র এবং শ্রাবণের অফুরন্ত ধারা যে বাংলার মাটির ভূষণ সে মাটির বিভূতি বিচিত্র ও অপূর্ব্ব।

পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে অক্রূর দত্ত পরিবার ও মাড়েদের পরিবার প্রভূত প্রভাব ও সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। এই দুই পরিবার বাংলার নবযুগের ব্যবসা-উদ্যোগের প্রথম পূজারী ও হোতা। চোরবাগানের মল্লিক পরিবার তৎপরবর্ত্তী কালে প্রাধান্য লাভ করেন। তাঁহারা নানা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিদেশী বণিক্‌দের সহযোগিতা করেন এবং বেনিয়ানরূপে বহু অর্থ সরবরাহ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অ-প্রকাশিত কাগজ-পত্র (Unpublished Records of the East India Company) হইতে জানা যায় যে, ঠিক পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে বহুবাজার অঞ্চলে একটি প্রভূত অর্থ- ও শক্তিশালী বসাক পরিবার ছিল। এই পরিবারের ব্যবসায়-সম্বন্ধ জাভা, সিঙ্গাপুর ও সিংহল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। ঐ কাগজ-পত্রে একটি মিত্র পরিবারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পরিবারের একটি যুবক উপেন্দ্র মিত্র ইংরেজদের নিকট দেশীয় সিল্ক যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় করিতেন। তিনি ভাল ইংরাজী জানিতেন। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি পত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অ-প্রকাশিত কাগজ-পত্রে (Unpublished Records of the East India Company) সঙ্কলিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইংরেজ বণিকের সহিত এত সৌহার্দ্দ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ১৭৭১ সালে ফোর্ট উইলিয়ামের প্রধান অধ্যক্ষকে লিখিতেছেন—"তোমাদের আগমনের পর হইতে কলিকাতা, হুগলী, শ্রীরামপুর, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, মুঙ্গের অঞ্চলে জিনিষের দাম অত্যন্ত বাড়িয়াছে। ১৶০ আনা মণ চাল ১৷৶০ আনায় বিক্রয়

হইতেছে। স্থানীয় শিল্পীদের কাজ বাড়িলেও আয় বাড়ে নাই—কারণ তোমরা ন্যায্য দাম দাও না।”

বাঙ্গালীর প্রাণ বাংলার আবহাওয়ার মত চিরস্বচ্ছ ও পরিকল্পনা-প্রবণ। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা বাংলার বুক দিয়া যেমন টল্‌টলে জল লইয়া ধাবিত হয়, বাঙ্গালীর মন ঐ সকল নদীর ছোট ছোট তরঙ্গের তালে তালে তেমনি উচ্ছল এবং প্রাণবন্ত নৃত্য করে। ভৌগোলিক কারণে বাঙ্গালীর মন কল্পনা-পরিকল্পনার অফুরন্ত আকর। সেইজন্য বাংলার বুকেই মস্‌লিন, হাতীর দাঁতের সূক্ষ্ম কাজ, অদ্ভুত তাঁতের কাজ, সাড়ীর পাড়ের যাদুকরী চাকচিক্য। সেইজন্য বাংলার রান্নাঘর পরিকল্পনার অদ্ভূত সমাবেশ-ক্ষেত্র, সেইজন্য বাংলার ঘরে ঘরে যেমন দুর্গাপূজা, যেমন প্রতিমা তেমন আর কোথায়? বাংলার ঘরে ঘরে যেমন ভাই-ফোঁটা, দাদা-দিদি, মামা-মামী—এত মিষ্ট আদরের সম্ভাষণ, পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার আবেষ্টন, তেমন আর কোন্ প্রদেশে? স্বদেশী যুগের পাঞ্চজন্য-শঙ্খধ্বনি মুখরিত হইয়াছিল মাদ্রাজে নয়, গুজরাটে নয়—বাংলার বুকে। বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর গান সারা ভারতবর্ষকে রোমাঞ্চিত আলোড়িত করিয়াছে। শিল্পোন্নতি, শিল্প-জাগরণ সেইজন্য বাংলার বুক হইতেই জাগ্রত হইয়াছে।

বাঙ্গালী! আজ তুমি নৈরাশ্যে দিন কাটাও, কেন না, তুমি আত্মবিস্মৃত জাত। গত একশত বৎসরে বাংলার বুকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যত মনস্বী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তেমন আর কোন্ প্রদেশে কিম্বা কোন্ বিদেশে? বিগত শত বর্ষের জীবনসমালী জগতের যে কোন দরবারে আমরা গর্ব্বের সঙ্গে উপহার দিতে পারি। আজ যে চারিদিকে রব উঠিয়াছে—“বাঙ্গালী গেল, বাঙ্গালী ছোট, বাঙ্গালীর দিন চ'লে গেছে”—সে সব অতি ফাঁকি কথা, মন-রচা কথা। সত্য যদি হিসাব করিয়া দেখ, আজও প্রমাণ পাইবে—সারা ভারতবর্ষে

আজ যত আবিষ্কার, নূতন শিল্প-উদ্যোগ, নূতন সৃষ্টি, নূতন রচনা-কৌশল, নূতন যন্ত্র আবিষ্কার, নূতন পন্থা নির্দ্দেশ, নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যের ইঙ্গিত-প্রকরণ—তার শতকরা পঁচাশী ভাগ বাঙ্গালীর অবদান! শিল্পক্ষেত্রে এবং নূতন ব্যবসা-প্রকরণে আজও বাঙ্গালীর মেধা ও পরিকল্পনা অগ্রজের ন্যায় অন্য সকল প্রদেশকে পথ-নির্দ্দেশ করিয়া স্বাধীনতার পথে অভিযান পরিচালিত করিতেছে। বাঙ্গালীর পরিকল্পনার তালে তালে যদি তাহার ব্যবসায়ে অঙ্কবুদ্ধি অঙ্গাঙ্গীরূপে আজ সংযুক্ত হইত, তবে তাহারা সারা দুনিয়ায় অপরাজেয় হইয়া অগ্রসর হইতে পারিত। কল্পনা ও পরিকল্পনা মনের চিৎশক্তির প্রকাশ এবং অঙ্ক ব্যবসা-বুদ্ধির নির্য্যাস। চাই এই দুয়ের সমন্বয়। নৈরাশ্যের কিছু নাই। যে জাতির মনে অফুরন্ত স্বচ্ছল পরিকল্পনা আছে সেই জাতি প্রকৃত শিল্পী—অঙ্ক, হিসাব-নিকাশ, ব্যবসার বিচার-বুদ্ধি, এ সকল অভিজ্ঞতার ফলে জীবনে সম্পদে পরিণত হয়। পুনরায় বলি, তোমার নৈরাশ্যের কিছু নাই। তোমার পরিকল্পনাময় মনকে স্বচ্ছল ও পুষ্ট রাখ, ব্যবসায়ে সমৃদ্ধি আর শিল্পোন্নতি অদূর ভবিষ্যতে তোমার সম্পদে পরিণত হইবে।

পরিশিষ্ট

কর্ম্মসাধনার মূর্ত্তপ্রকাশ নিরলস অধ্যবসায়ের প্রাণবান

প্রতীক সার্থকব্রতী

কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ মহাশয়ের

পঞ্চাশৎতম জন্মদিবস জয়ন্তী উৎসবে

অভিনন্দন

হে বঙ্গগৌরব! আমরা তোমার গুণমুগ্ধ সহকর্ম্মীবৃন্দ, তোমার বিজয়াভিযানের সহযাত্রী। তোমার কর্ম্মমুখর জীবনের অর্দ্ধশত-বৎসরের স্মরণীয় দিনে তুমি আমাদের অন্তরের অভিনন্দন গ্রহণ কর।

হে কর্ম্মবীর! বর্ষার বারিধারা যেমন নিদাঘ-নীরস ধরণীর বুকে শ্যামলশোভা বিকশিত করে, তেমনি তোমার নিরলস কর্ম্মধারা হৃতসর্ব্বস্ব নিরাশ বাঙ্গালী-হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়াছে। হে ধীমান, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

হে পুরুষকার! তোমার কীর্ত্তির অপেক্ষা তুমি মহৎ। তোমার অতুলণীয় একাগ্রতা, অমিত সাহস, অপ্রমেয় অধ্যবসায়, কল্পনাতীতকে রূপায়িত করিয়াছে। তুমি ধন্য। তুমি আমাদের বিস্ময়বিমুগ্ধ অন্তরের স্তুতি গ্রহণ কর।

হে বিজ্ঞ! তোমার অন্তরে যে বিরাট শক্তি, তাহার চরণে ঝটিকার অপেক্ষা প্রমত্ত গতি, তোমার বাহুতে বজ্রের মত সুকঠিন ক্ষমতা, তোমার নেত্রে স্বপ্ন ও সাধনার সার্থক দীপ্তি, তোমার ললাটে বিজয় তিলক। হে শক্তিমান, তুমি আমাদের অভিবাদন গ্রহণ কর।

হে সব্যসাচি! জাতির পুনর্জাগরণের প্রয়াসক্ষেত্রে নব নব দিগ্বিজয়ের পুরোধা হইয়া তুমি সমগ্র বাঙ্গালীকে সাফল্যের পথে লইয়া চল। নিপীড়িত মনুষ্যত্বের ব্যর্থতার গ্লানি হইতে বাঙ্গালীকে তোমারই মত মুক্ত হইবার পন্থা নির্দ্দেশ কর। মহাকালের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের ঐকান্তিকতা গ্রহণ কর। ইতি—

তোমার গুণমুগ্ধ—

সহকর্ম্মীবৃন্দ।

দাশনগর, হাওড়া।
১৬ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৫১ সাল।
(ইং ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৪)

জয়ন্তী উৎসবে প্রত্যভিভাষণ

কর্ম্মবীর শ্রীআলামোহন দাশ

আজ আপনারা আমার পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি উপলক্ষে আমাকে অভিনন্দিত করিবার আয়োজন করিয়াছেন। এই অভিনন্দন উপলক্ষে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমার একটি কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে।

আমি সর্ব্বপ্রথমে আমার তর্পণ জ্ঞাপন করিতেছি, আমার সেই লক্ষ লক্ষ অশরীরী ভাই-বোনদের উদ্দেশে যাহারা এই সেদিন মাত্র ১৩৫০এর দুর্ভিক্ষে নিঃশব্দে নির্ব্বিকারে প্রাণ বলি দিয়া বাঙ্গালার চিরন্তন দুঃখ ও দারিদ্র্যকে অমর স্মৃতির রূপ দিয়া গেল।

এইবার আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি একটি জীবন্ত বাঙ্গালীকে যাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মজীবনে সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়। এই ভীষ্ম-প্রতিম অমর পুরুষ হইতেছেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। তিনি ভক্তের সাধনায় প্রীত ভগবানের মত স্বয়ং অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার পদরেণুস্পর্শে এই দাশনগরকে পবিত্র করিয়া আমার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। তিনি এই দাশনগরকে "মরণোন্মুখ বাঙ্গালীর তীর্থক্ষেত্র" বলিয়া অভিহিত করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। তিনি যেন আরও কিছুদিন সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিয়া তাঁহার সাধের বাঙ্গালী জাতিকে এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষের পরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যান।

আজ আমার এই জন্মতিথি উৎসবে আমার এই কথাই মনে হইতেছে যে, যে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি,

সেই বিরাট জাতির জীবন সংরক্ষণের জন্য আমরা কি করিয়াছি এবং কি করিতেছি; আমার এই প্রশ্ন বোধ হয় মোটেই অবান্তর নহে। সত্যই বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আজ আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত জীবনের একমাত্র দায়িত্ব, কর্ত্তব্য ও সমস্যা।

যেদিন বাঙ্গালীর আদরের "বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক" ফেল হইয়া গেল সে দিনের কথা মনে করুন। তাহার পূর্ব্বে স্বদেশী যুগের বাঙ্গালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানা, কয়লার খনি, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী অবাধে অবাঙ্গালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে। সেদিন এই বাঙ্গালীর বুকে যে হতাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তাহা আজও সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই।

এই অন্ধকারেরই অন্তরালে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী অনর্থক অন্নাভাবে পরপারে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার প্রতীকারের উপযুক্ত চেষ্টার এখনও অভাব। আমার মনে হয়—কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা কোন জাতিকে কোনও দিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায় নাই, এখনও পারা যাইতেছে না—ভবিষ্যতেও পারা যাইবে না। এখানে আপনাদের কাছে বলিতে চাই, আমার এই অনুভূতিই হইল দাশনগর-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি।

দাশনগর একজনের সৃষ্ট নহে। ইহার সাফল্যের মূলে রহিয়াছে বহুসংখ্যক একনিষ্ঠ বাঙ্গালীর সাধনা ও প্রাণপণ পরিশ্রম। অবশ্য আমার সম্মুখে যে অভ্রভেদী আদর্শ রহিয়াছে তাহার তুলনায়, আমাদিগের চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত যেটুকু হইয়াছে, তাহা কেবল সমুদ্রের সম্মুখে গোষ্পদের তুল্য।

কিন্তু ইহার মধ্যেই যে বাঙ্গালী অন্নাভাবে মরিয়া শেষ হইয়া যাইতেছে। আর সেই অন্নাভাবের মুখ্য কারণ হইতেছে, বাঙ্গালীর জাতীয় শিল্প তথা কল-কারখানার মর্ম্মঘাতী অভাব। আর অভাবের

জন্য দায়ী আমাদের আলস্য, অনিচ্ছা ও জাতীয়তা-বোধের অপরিমিত দৈন্য।

এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে শুধু এক কাপড়ের জন্যই আমরা বৎসরে প্রায় ৩০ কোটি টাকা অবাঙ্গালীর দেশে চালান দিয়াও লজ্জাবোধ করিতেছি না। এক চিনির জন্য বৎসরে সাড়ে ৬ কোটি টাকা বাঙ্গালার বাহিরে পাঠাইয়াও আমরা জীবনকে তিক্তবোধ করিতেছি না। এ দেশের পাটকলগুলি বৎসরে বহু কোটি টাকার মাল বেচিতেছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর পাটকলের স্থান টাকায় এক আনাও নহে। হতভাগ্য বাঙ্গালী কৃষকের যৎসামান্য মজুরী বাদ দিলে বাকী মোটা অংশ অবাঙ্গালীর পকেটে চলিয়া যাইতেছে।

কিন্তু এ অবস্থা আরও অনেক দিন চলিতে দেওয়া ঠিক নয়। বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইবে। বাঙ্গালীকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু উপায় কি? উপায় হইতেছে জাতীয় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। ইংরেজ এদেশে আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালী কোন কিছুর জন্য পরমুখাপেক্ষী ছিল না। বাঙ্গালার সেই অবস্থা—সেই সুদিন—সেই সার্থকতা আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে; সূচ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত সমস্তই বাঙ্গালীকে নিজে করিয়া লইতে হইবে। কেবলমাত্র কুটীর-শিল্পের দ্বারাই জাতির অভাব মিটান যাইবে না, ইহা ধ্রুব সত্য।

আজ বাঙ্গালীকে বিংশ শতাব্দীর নীতিতন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়া—বিংশ শতাব্দীর যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া লইয়া—বিংশ শতাব্দীর বেগে জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতে হইবে।

আজ এই উৎসবের আসরে আপনারা আনন্দিত ও উল্লসিত, কিন্তু আমার কাণে উৎসব-সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে আসিয়া আঘাত

করিতেছে দারুণ দীর্ঘশ্বাস। বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস ভেদ করিয়া লক্ষ লক্ষ অশরীরী বাঙ্গালীর অন্নক্লিষ্ট আত্মা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। তাহারা যে আমাকে বলিতেছে, "আলামোহন, চোখ চাহিয়া দেখ, তোমার বাঙ্গালী জাতি বিশ্বপ্রেমের স্রোতে কল্পনা-বিলাসের ধারায় কোন্ অকূলে ভাসিয়া চলিয়াছে। তুমি আজ জাতির গর্ব্ব করিতেছ, কিন্তু চাহিয়া দেখ, তোমারই দেশের কত সহস্র সংসার অন্নাভাবে শ্মশান হইয়া গেল।" তাহারা যেন চীৎকার করিয়া আমাকে বলিতেছে, "এখনও সময় আছে, এখনও সংযত হও, এখনও সঙ্কল্প কর, তাহা না হইলে বাঙ্গালার প্রতি মাঠ, প্রতি প্রাঙ্গণ জনপ্রাণীহীন শ্মশানে পরিণত হইবে।"

প্রিয় সহকর্ম্মিগণ, আজ আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, আমি সানন্দে গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু আপনাদের নিজ নিজ জীবনে অবশ্যপ্রাপ্য আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির কি ব্যবস্থা করিতেছেন? জাতি যদি মরিয়া যায় তাহা হইলে কাহার আশীর্ব্বাদ কেই বা গ্রহণ করিবে? যদি আপনারা আপনাদের শ্রম, শিল্প ও সাধনার দ্বারা আবার বাঙ্গালী জাতিকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন তাহা হইলেই আমার এই জয়ন্তী উৎসব সার্থক হইবে।

এ কথা আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, আমার জীবনের এই সামান্য সার্থকতা—যাহার জন্য আপনারা এই জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা সম্ভব হইয়াছে এই কারণে যে, আমি পাইয়াছিলাম এবং পাইতেছি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির আশীর্ব্বাদ। যদি আপনারাও জাতির অমরত্ব নিশ্চয় করিয়া ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী জাতির আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলেই আমার এবং আপনাদের জীবনধারণ সার্থক হইবে।

—:*:—